★ভারতের প্রায় ১৯.০৭ কোটি মানুষ
(জনসংখ্যার প্রায় ১৪.৫ শতাংশ)
প্রতিদিন অভুক্ত থাকেন

★ভারতে উৎপাদিত খাদ্যের
প্রায় ৪০ শতাংশ
গুদামে পচে নষ্ট হয়

সূত্র : আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি দপ্তর

Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13
বিজ্ঞান মনস্ক'র ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সমীক্ষণ

নবম বর্ষ❖সংখ্যা ২❖জুন ২০১৯

খাদ্যের অভাবে মাটি খেয়ে দুই শিশুর মৃত্যু

■সম্পাদকীয়
মিশন শক্তি - একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ
■রিপোর্ট
বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনতার আবিশ্ব আন্দোলন
■মহাকাশ গবেষণার রোজনামচা
চাঁদের 'অন্ধকার' পৃষ্ঠে অবতরণ করল চ্যাং - ৪
■ধারাবাহিক নিবন্ধ
মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ
■জানা-অজানা
দেশী খাদ্য বিদেশী খাদ্য
■জীবনী ও আবিস্কারের কাহিনী
দিমিত্রি মেন্ডেলেভ ও পর্যায় সারণী
■বিশেষ রচনা
হিমালয়ের পাহাড়ী নদীগুলি কি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে?

কাল্পনিক চিত্র

নবম বর্ষ❖সংখ্যা - ২❖জুন ২০১৯

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

■সম্পাদকীয় ঃ ২
মিশন শক্তি একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ

■সমাজ দর্পণ ঃ ৩
খাদ্যের অভাবে মাটি খেয়ে দুই শিশুর মৃত্যু

■রিপোর্ট ঃ ৫
বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনতার আবিশ্ব আন্দোলন

■মহাকাশ গবেষণার রোজনামচা ঃ ৭
চাঁদের 'অন্ধকার' পৃষ্ঠে অবতরণ করল চ্যাং - ৪

■ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ৯
মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

■জানা-অজানা ঃ ১৫
দেশী খাদ্য বিদেশী খাদ্য

■চিঠিপত্র ঃ ২০

■জীবনী ও আবিষ্কারের কাহিনী ঃ ২২
দিমিত্রি মেন্ডেলেভ ও পর্যায় সারণী

■বিশেষ রচনা ঃ ২৭
হিমালয়ের পাহাড়ী নদীগুলি কি ... বিপজ্জনক হয়ে উঠছে

■বিজ্ঞানের বিস্তারিত খবর ঃ ৩২

■বিজ্ঞানের খবর ঃ ৩৪

■সংগঠন সংবাদ ঃ ৩৬

■গল্প ঃ ৩৮
ভূতের লাভ

■প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঃ ৪০
পড়ার বইয়ের বাইরে পড়া

ঘোষণা অনুসারে মে মাসে পত্রিকা প্রকাশ করতে না পারায় আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তবে ঘোষণা অনুসারে অগাস্ট এবং নভেম্বরে বাকি দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হবে – সম্পাদক

সম্পাদকীয় ঃ

মিশন শক্তি
একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ

চলতি বছরের ২৭শে মার্চ ওড়িশার ভূবণেশ্বর শহর থেকে ১৫০ কি.মি পূর্বে এ.পি.জে. আবদুল কালাম দ্বীপ থেকে একটি অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিশাইল মহাকাশে নিক্ষেপ করা হয়।

এই অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিশাইলটি উৎক্ষেপণের তিন মিনিটের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩০০ কি.মি উচ্চতায় ভারতেরই একটি লো-আর্থ অরবিট কৃত্রিম উপগ্রহকে আঘাত করে ধ্বংস করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অভিযানকে "মিশন শক্তি" নামে অভিহিত করে বলেন যে, "India enters elite space power club" অর্থাৎ আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের পরে ভারত মহাকাশে চতুর্থ শক্তিশালী দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করল।

এখন জানা দরকার অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিশাইল আসলে কি? অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিশাইল হলো এমন এক ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র যার দ্বারা সেনাবাহিনীর রণকৌশলগত লক্ষ্যপূরণে মহাকাশে অবস্থিত কোনো কৃত্রিম উপগ্রহকে ধ্বংস করা যায়। অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিশাইলের প্রাথমিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হলো মহাকাশে নিজের দেশের যে সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে সেগুলির নিরাপত্তা প্রদান এবং অন্য কোন দেশ মহাকাশ থেকে আক্রমণ করলে তাকে মহাকাশেই প্রতিহত করা। অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিশাইলের সঙ্গে পরমাণু অস্ত্র ও যুক্ত করা যায়।

১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ ধ্বংসকারী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে। কিন্তু তা আকাশ থেকে ছুঁড়তে হতো। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষেপণ করা যায় এমন উপগ্রহ ধ্বংসকারী ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করে। ২০০৭ সালে ঐ একই সফলতা লাভ করে চিন। ২০১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বিজ্ঞানীরা এই প্রযুক্তি রপ্ত করে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঘোষণা করা হয়েছিল যে কয়েক মাসের মধ্যে ভারতের পক্ষ থেকে অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিশাইল উৎক্ষেপণ করা হবে। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর পরে এই সময় অর্থাৎ সাতদফা লোকসভা নির্বাচনের ঠিক সপ্তাহ দুয়েক আগে মিশন শক্তির কি প্রয়োজন ছিল? যদিও উৎক্ষেপণের বিষয়ে ইলেকশন কমিশনের অনুমতি ছিল বলেই খবর প্রকাশিত।

●*পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

সমাজ দর্পণ ঃ

খাদ্যের অভাবে মাটি খেয়ে দুই শিশুর মৃত্যু

কর্ণাটক রাজ্যের গুডিবান্দা জেলা। চারদিকে সুউচ্চ অট্টালিকা, রকমারি খাদ্যের পসরা কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু ভূমিহীন কৃষক পরিবারের তাতে ক্ষুধা নিবারণ বা নিশ্চিন্ত আশ্রয় মেলে না। অগত্যা গুডিবান্দা গ্রামের মহেশ তার স্ত্রী নীলাবেণীকে সাথে নিয়ে খাদ্যের অন্বেষণে আরও অনেকের সাথে প্রায় দুই দশক আগে বেরিয়ে পড়েছিল। নীলাবেণী তার বোনকেও সাথে নিয়েছিল। খাদ্য আর মাথার উপর ছাদের সন্ধানে ওরা বহু পথ ঘুরে এসে পড়ল অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার বান্ডলাপল্লী গ্রামে। সড়কের ধারে খোলা মাঠে সংসার পাতল ওরা। কতগুলি কাঠের টুকরো আর ছেঁড়া জামা-কাপড় দিয়ে ওরা ঘর বাঁধল সেই মাঠে। ওরা একা নয়, ওদের মত আরও অনেকে। কোনদিন কাজ মেলে আবার কোনদিন মেলে না। পথচলতি বাবুরা কখনও ভিক্ষা দেয় কখনও দেয় না। আধপেটা-সিকিপেটা খেয়েই ওরা জীবনযুদ্ধ চালাতে লাগল। স্বামী হারা নীলাবেণীর বোনও একদিন তাদের মেয়ে শিশু ভেন্নেলাকে দিদির হাতে তুলে দিয়ে জীবনসংগ্রামে হেরে গেল।

তারপর থেকে মহেশ আর নীলাবেণী নিজেদের পাঁচ সন্তান আর বোনের মেয়ে ভেন্নেলাকে নিয়ে ক্ষুধার সাথে লড়াই লড়তে লাগল। রাতে খোলা আকাশের নীচে শোয়া আর দিনভর কাজের সন্ধানে ভিক্ষার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে ওদের দিন কেটে যেত। বাচ্চাগুলোর এত ক্ষুধা নিয়ে মহেশ আর নীলাবেণীর

➔

●*মিশনশক্তি একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ*

প্রকৃত ঘটনা হল এই কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল ২০১৭ সালে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির এ বিষয়ে বক্তব্য হলো লোকসভা নির্বাচনে, “রাফাল” কে ফিকে করে “জাতীয় নিরাপত্তা” – প্রচারকে কাজে লাগাতেই এই সময় মিশন শক্তি কার্যকারী করা হয়। কাশ্মীরে পুলওয়ামার ঘটনার পর সরকারের ভূমিকাকে ‘দেশভক্তি’ রূপে নির্বাচনী বিজ্ঞাপন প্রচারের পর মিশন শক্তি সম্পর্কে বিরোধীদের বক্তব্যকে একেবারে অমূলক বলা যায় না।

কিন্তু মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বেই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিশাইলের কৌশল অর্জন করেছিল। Defence Research and Development Organisation (DRDO) এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে মিশন শক্তি কে সফল করতে ৪০ জন মহিলা সমেত মোট ১৫০ জন বিজ্ঞানী সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। মিশন শক্তি – খবর হওয়ার পরে বিভিন্ন রাষ্ট্র মহাকাশে দূষণের জন্য ভারতকে দায়ী করতে থাকে। নাসার প্রধান অধিকর্তা জিম ব্রাইনেস্টাইন এই ঘটনাকে প্রথমে “terrible thing” বা বিপজ্জনক বিষয় আখ্যায়িত করলেও পরে হোয়াট-হাউসের নির্দেশ মতো জানিয়েছেন যে ইসরোর সঙ্গে নাসার সম্পর্ক অটুট থাকবে। নরেন্দ্র মোদী বলেছেন ভারতের পক্ষ থেকে লোয়ার আর্থ অরবিটে আর অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিশাইল টেস্ট করা হবে না। তাছাড়া মহাকাশের যে অঞ্চলে পরীক্ষাটি সম্পন্ন হয়েছে তা International Space Station থেকে প্রায় ১২০ কিমি নীচে। ফলে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের কোন ক্ষতির সম্ভবনা নেই। আর ৪৫ দিনের মধ্যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ বিলীন হয়ে যাবে। নাসার চাপে প্রধানমন্ত্রী ৪৫ দিনের মধ্যে ধ্বংসাবশেষ বিলীন হওয়ার কথা বললেও তা বিলীন হয়ে কোথায় যাবে কি হবে তার ব্যাখ্যা আমরা পাই নি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন মিশন শক্তির ফলে হিন্দুস্থান অ্যারোনেটিক্স লিমিটেড’র বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে একদিনে ব্যবসা ৭.২৫% থেকে ৭.৭৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ শুধু উগ্রজাতীয়তাবাদ বা জাতিদম্ভের প্রচার নয়, মিশন শক্তি পুঁজিপতিদের মুনাফাও দিয়েছে।

বিজ্ঞান শ্রেণী নিরপেক্ষ হলেও শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণী নিজ স্বার্থে প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের রাজনীতিকরণ করে চলে। মিশনশক্তি বিজ্ঞানের রাজনীতিকরণ এর ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন মাত্র।■

মাঝে মাঝে রাগ হত। বাচ্চাগুলোও এতদিনে বুঝে নিল চাইলেই খাবার মিলবে না। তাই নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরা করার ব্রতে যেন মেতে উঠল!

খেলতে খেলতে সন্তোষ একদিন মাঠে পড়ে গিয়ে দেখল 'আরে এখানকার মাটি তো বেশ নরম আর চটচটে! খেতে তেমন বিস্বাদও নয়!' 'নতুন আবিষ্কারে' মেতে উঠল ছয় ভাইবোন। গপগপ করে বেশ খানিকটা মাটি খেয়ে নিলে পেটের জ্বালাটাও যেন বেশ কম লাগে! এমনি করেই ইচ্ছামত মাটি আর 'পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা'র মত কখনও সখনও মা-বাবার দেওয়া খাবার খেয়েই ওদের জীবন যুদ্ধ চলছিল।

কিন্তু ২০১৮ সালের নভেম্বরে সন্তোষ রণে ভঙ্গ দিল। কি করবে মহেশ আর নীলাবেণী? পেটে খাবারই নেই, কোথায় পাবে জ্বালানী কাঠ যে সন্তোষের শেষকৃত্য করবে? অগত্যা নিজেদের সাধের ঘরের পাশেই পুঁতে ফেলল ছেলেকে। এখানেই শেষ নয়। গত ২৮শে এপ্রিল বোনের মেয়ে ভেন্নেলাও সন্তোষের পথ ধরল। তাকেও ভাইয়ের পাশে সমাধিস্থ করে মহেশ আর নীলাবেণী বাকিদের অপেক্ষায় রইল।

এতদিন কত পুলিশের গাড়ি, অঙ্গনওয়ারির দিদিমনিরা এখান দিয়ে গেছে। বাচ্চাদের জন্য নীলাবেণী তাদের কাছে কম আবদার করেনি। কিন্তু এবার ওদের নজর পড়ল। ছোট্ট মেয়েটা, মানে ভেন্নেলা কই! আর ছয় বছরের ছেলেটা সে কোথায়? কান্নায় ভেঙে পড়ল নীলাবেণী আর মহেশ। এতদিনের গোপন খবর জানিয়ে দিল ওদের।

পুলিশ লাশ তুলে ময়নাতদন্ত করে দেখল বাচ্চা দুটোর পেটে কোন খাদ্য নেই, শুধুই মাটি। সোরগোল পড়ে গেল সংবাদ মাধ্যমে। বাবুরা, দিদিমণিরা ঘন ঘন আসতে লাগল, ফটো তুলতে লাগল খচাৎ খচাৎ।

পুলিশের একজন কর্মী আক্ষেপ করে বলল "আমরা প্রায় রোজই এখান দিয়ে যাই। কিন্তু এরা যে এত ভয়াবহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে জানতেই পারেনি"। অঙ্গনওয়ারির দিদিমণি বলল "ওরা মাঝে মাঝে সাহায্য চেয়েছে, কিন্তু ওদের আধার কার্ড নেই, তাই আমরা কি করব"! মহকুমার অফিসার টি অজয় কুমার মন্তব্য করেন "ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে এদের পুর্নবাসনের কথা ভাবতে হবে।"

সন্তোষ আর ভেন্নেলা মরে গিয়ে সভ্য সমাজের গালে থাপ্পড় মেরে বুঝিয়ে দিয়ে গেল আমরা কোন সমাজে বাস করি!■

খাদ্যের অভাবে শিশুদের ধুলা, মাটি ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাসকে বিজ্ঞানের ভাষায় জিওফ্যাগি বলা হয়। প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগ থেকেই এই অভ্যাসের প্রমাণ মিলেছে, যেমন হোমো হ্যাবিলিসদের মধ্যে। প্রাচীন পৃথিবী থেকে বর্তমান সময়কালে এই অভ্যাসের প্রমাণ মিলেছে বার বার। বর্তমান সময়কালে আদিবাসী গোষ্ঠী এবং দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের শিশুদের মধ্যে বিশেষতঃ ৬ মাস থেকে ৩০ মাস বয়স অবধি এটা বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাচীনকাল থেকে জাপান এবং কোরিয়া বাদে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র (বিশেষত আফ্রিকা মহাদেশে) এই ঘটনা দেখা যায়। দীর্ঘদিন এই অভ্যাস চললে প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন অবস্থায় পুষ্টির অভাবে সংক্রমণে মৃত্যু হয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, পুষ্টির অভাব মেটাতেই জিওফ্যাগির মত স্বভাব গড়ে ওঠার প্রধান কারণ। মাটির মধ্যে নানা লবণ থাকায় তা বিস্বাদও হয় না। মাটির মধ্যে বেনটোনাইট বা মুলতানি মাটি হজমের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন মিষ্টিতে বিশেষতঃ লাড্ডু তৈরিতে এর ব্যাপক ব্যবহার আছে। কেয়োলিন বা চীনা মাটি বিভিন্ন ঔষধ এবং দাঁতের মাজনে ব্যবহৃত হয় বেস মেটিরিয়াল হিসাবে। আট্টাপুলগাইট জাতীয় ম্যাগনেশিয়াযুক্ত মাটি ডায়েরিয়ার ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। একে ফুলার্স আর্থ বলে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মাটি পাওয়া যায়।

রিপোর্ট ঃ

বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রা
বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনতার আবিশ্ব আন্দোলন

– ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ

৪ঠা মে দুনিয়া জুড়ে পালিত হল 'বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রা'। এই প্রথম নয়, গত ২০১৭ সালেই আসলে এই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত। প্রথমে আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরের বিজ্ঞানীদের আহ্বানে পৃথিবীর ছয়শ শহরে প্রায় দশ লক্ষেরও বেশী মানুষের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অংশগ্রহণে, সূচনাতেই এই বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ড বিশ্ববাসীর নজর কাড়তে সক্ষম হয়। ২০১৭ সালের ২২শে এপ্রিল এবং ২০১৮ সালের ১৪ই এপ্রিল পালিত হয় এই কর্মসূচী। গত কয়েক বছরে তা নামে আকারে প্রকারে বদলে গিয়ে ব্যাপক বিস্তৃত জন আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও এর শুরুটা করেছিলেন প্রকৃত অর্থে যাদের বিজ্ঞানী বলা হয় তারাই কিন্তু আজ এতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সক্রিয় ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন। এই আন্দোলনে আজ যেমন বিজ্ঞানীরা আগের মতোই রয়ে গেছেন, তেমনি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক-বিজ্ঞান ও সামাজিক কর্মী তথা তাদের সংগঠন এবং বিভিন্ন পেশাগত সংগঠন। বলাবাহুল্য এ রকম স্তরের অসংখ্য মানুষ সামিল হবার ফলেই বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রা বলিষ্ঠ হয়েছে এবং তার লক্ষ্যও স্পষ্ট হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের বিভিন্ন শহরের বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠন এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ শুরু থেকেই 'বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রা' আয়োজন করে চলেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা, যাদের আমরা সাধারণত গবেষণাগারের চারদেওয়ালে বন্দী থাকতেই দেখি, হঠাৎরাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে যাচ্ছেন কেন? শুধু তাই নয়, এই বিজ্ঞানীরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এটাও স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, দেশে দেশে ক্ষমতাসীন সরকারগুলির বিজ্ঞান প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি ও সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধেই তাঁদের এই ধারাবাহিক আন্দোলন। এটা সম্ভবত আরও অপ্রত্যাশিত কারণ আমাদের মধ্যে ধারণা আছে বিজ্ঞানীদের পরিমণ্ডল এবং তাদের কর্মক্ষেত্র আর বাস্তব ব্যবহারিক রাজনীতির জগতের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য দেওয়াল আছে। যদিও বহু আগেই আইনস্টাইন, জে বি এস হলডেন, মেঘনাদ সাহার মত জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা আমাদের এই ভুল বারবারই ভেঙ্গে দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে এই বিজ্ঞানীরা নেহাতই গবেষক হলেও এক গভীরতর সংকটের মুখে পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। কী সেই সংকট? বিজ্ঞানীদের মতে যে বিজ্ঞান আজকের মানব সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ তার অস্তিত্বের বিপন্নতা উপস্থিত হয়েছে এবং তা আসছে সরকারগুলির গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত এবং প্রচারিত বক্তব্যের মধ্য থেকে। এটা কোনো নির্দিষ্ট দেশে নয়, গোটা বিশ্বব্যাপী সংগঠিত হচ্ছে। কোন্ নীতি? কি সিদ্ধান্ত? কোন্ বক্তব্য? শুরুতে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ট্রাম্প সরকারের পরিবেশ নীতির কথাই তুলে ছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল বহুজাতিক কোম্পানিগুলি, যারা বিশ্বব্যাপী ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানী তে অর্থ লগ্নী করে রেখেছে তাদের স্বার্থে সরকার নতুন পরিবেশ নীতি নিয়েছে। শুধু তাই নয় এই বহুজাতিক কোম্পানিগুলি পয়সা দিয়ে নকল গবেষণাপত্র প্রকাশ করছে আর সরকার এই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে পরিবেশ নীতি নির্ধারণ করছে। এই অভিযোগ অবশ্য নতুনও নয় বা শুধু পরিবেশ বিষয়ক নীতিতে সীমাবদ্ধও নয়। পরবর্তীতে বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রায় সরকারের গবেষণা ও শিক্ষানীতিও অন্তর্ভুক্ত হয়। সেটা কেন? কারণ দেখা যাচ্ছে সরকার প্রতিবছর মৌলিক গবেষণার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ কমিয়ে ইউনিভার্সিটি ও গবেষণা সংস্থাগুলিকে 'নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর' করতে বলছে। ইউনিভার্সিটি ও গবেষণা সংস্থাগুলি টাকা কোথা থেকে জোগাড় করবে? এরা তো আর লাভজনক সংস্থা নয়। প্রকৃতি সমাজের এযাবত অনাবিস্কৃত রহস্যের নিয়মের অনুসন্ধানই গবেষণার কাজ। দীর্ঘ সময় এবং শ্রম ও অধ্যাবসায়ের পরে গবেষণা যখন শেষ হয় তখনই বোঝা যায় তা মানুষের কী কাজে লাগবে এবং কিভাবে লাগবে। এমনকি গবেষণা অসফল হলেও তাতে বিজ্ঞানের নতুন রাস্তা খুলে যেতে পারে। এখন যদি ইউনিভার্সিটির নিজেদের ফান্ড নিজেদেরই জোগাড় করতে হয় তাহলে পরিকাঠামোর জন্য এবং গবেষকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে? রাস্তা দুটো – এক শিক্ষার্থী ও গবেষকদের থেকে ফী আদায় করা অথবা বহুজাতিক কোম্পানিগুলির লগ্নি, স্কলারশিপ বা স্পন্সরশীপ জোগাড় করা। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় পদক্ষেপের

ক্ষেত্রেও, হয় ছাত্রদের উপর ফী ধার্য্য করতে হবে অথবা এমন একটি পদক্ষেপ দিতে হবে যার পর গবেষণা আর গবেষণা থাকে না। কারণ লগ্নিকারী বহুজাতিক সংস্থাই এবার ঠিক করবে কোন বিষয়ে অর্থাৎ কিসে টাকা খাটালে সর্বাধিক মুনাফা ন্যূনতম সময়ে উঠে আসবে এবং যে গবেষণার ফলে কোম্পানির ব্যবসার উপর খারাপ প্রভাব পড়বে সেই গবেষণাপত্র দিনের আলোর মুখ দেখবে না। উদাহরণস্বরূপ, ক্যান্সারের চিকিৎসা এখনো পর্যন্ত সর্বাধিক লাভজনক কিন্তু এখনও ক্যান্সারের মূল চিকিৎসা অর্থাৎ যাতে এই রোগ না হয় অথবা হয়ে গেলে রোগের যেকোনো স্তরে অথবা শরীরের যে জায়গাতেই রোগ হোক না কেন তার পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয় নি। যদি সেটা আবিষ্কার হয়ে যায় তা কোন অবস্থাতেই বর্তমান চিকিৎসা থেকে লাভজনক হবে না বলেই বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। সে ক্ষেত্রে মানবকল্যাণে এই গবেষণার ছাত্রপত্র পাওয়া যাবে কি? যদি হত, তাহলে পৃথিবীতে মারণাস্ত্র উৎপন্ন হত না। এই উদাহরণ কল্পনাপ্রসূত নয় বিজ্ঞানী মহল থেকে এই সন্দেহ ইতিমধ্যেই উত্থাপন করা হয়েছে। আরেকটি অসুবিধা হল জনমতকে প্রভাবিত করে সরকারের দ্বারা মুনাফার অনুকূলে নকল গবেষণা করানো। যার উদাহরণ আমেরিকার বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। প্রবন্ধে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকারগুলির অবলম্বিত এই নীতির সবচেয়ে জীবন্ত উদাহরণ ভারতে পাওয়া যায়। নয়ের দশক থেকে ভারতে পর পর ক্ষমতায় আসা নানা রঙের পার্টির সরকার ক্রমান্বয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এই পলিসি অবলম্বন করে চলেছে। এবং এই লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি স্বশাসন ও ইউ জি সি সংস্কারের নামে অনেক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে দেশ এমন কি আমাদের রাজ্যের ছাত্ররাও লড়াই করেছে। ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার জন্য ব্যয়ভার ক্রমান্বয়ে ছাত্রদের উপর চাপানো হয়েছে এবং গবেষণার উপর স্পন্সর কোম্পানিগুলির অবিসংবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও সরকারী ব্যয় ক্রমাগত কমিয়ে এনে প্রাইভেট মুনাফা ভিত্তিক সংগঠনগুলিকে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের দখল দেওয়া হয়েছে। যেহেতু উচ্চশিক্ষার পাঠ শেষ করেই গবেষণার দরজা খোলে, ফলে গবেষণা ক্ষেত্রের উপরও এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে। বলা বাহুল্য সরকার জিডিপি বৃদ্ধির দর বাড়ছে বলে যতই দাবী করছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই এইগুলি ঘটে চলেছে।

সমাজবিজ্ঞান আমাদের শেখায় গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বের সরকারগুলির এই পদক্ষেপ সমূহ কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয় বরং তা সমাজব্যবস্থার গভীরতর উৎস থেকে উদ্ভুত। একচেটিয়া পুঁজির শাসনাধীন বিশ্বব্যবস্থা আজ যে স্থায়ী মন্দাজনিত সঙ্কটের গর্ভে নিমজ্জিত, তার থেকে সাময়িক উত্তরণের লক্ষ্যে ন'য়ের দশকের গোড়া থেকে বিশ্বব্যাপী সরকারগুলি যে ব্যবস্থা নিচ্ছে গবেষণা ও শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী পদক্ষেপ আসলে তারই অন্তর্ভুক্ত এবং এই ব্যবস্থার মধ্যে তার সমাধান নাই। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে এতেও সন্দেহ নাই। এছাড়া সরকারি মহল থেকে অপরীক্ষিত-অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য প্রচার করার ব্যাপারে বিগত সময়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের প্রবক্তারা আগেকার সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের নামে পৌরাণিক কাহিনী-গল্প-গাঁথাকে বিনা তথ্য প্রমাণে এবং গবেষণায় বিজ্ঞানের মোড়কে হাজির করা হচ্ছে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী থেকে তুলে প্রাচীনকালে উড়োজাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র, জিন প্রযুক্তি, ইন্টারনেট ইত্যাদিকে বিজ্ঞান বলে উপস্থাপন কেবল রাজনৈতিক সভায় করা হচ্ছে এমন নয়, বিজ্ঞান কংগ্রেসের মতন প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান এইসব বক্তব্যে কালিমালিপ্ত হয়েছে। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে বিজ্ঞান কংগ্রেসকে ক্ষমা চেয়ে সরকারি প্রতিনিধিদের দ্বারা অবৈজ্ঞানিক বক্তব্যকে প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে। অবশ্য ভুললে চলবে না আগেকার কেন্দ্রীয় সরকারের আমলেও সাধুর স্বপ্ন অবলম্বন করে জিওলজিক্যাল সার্ভের মত প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে সোনা উদ্ধারের নামে খননকার্য্য চালানো হয়েছিল। অন্যদিকে জ্যোতিষের মত বাতিল শাস্ত্রকে শুধু প্রচারে বা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীর দ্বারা বৈধকরণ নয় হাসপাতালের মতন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে ভাগ্য গণনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরাবাসী এটাও ভোলেননি যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন পূর্বতন সরকারের বিজ্ঞান মন্ত্রী জ্যোতিষশাস্ত্রীদের সম্মেলনে প্রকাশিত স্মরণিকায় শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে রাজ্যের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন। বলার উদ্দেশ্য এটাই যে, দলের পতাকা নির্বিশেষে সকল শাসকরাই এক। অথচ, এটা করা হচ্ছে সেই দেশে যেখানে প্রাচীনকাল থেকে সত্যিকারের বস্তুভিত্তিক দর্শন ও বিজ্ঞান সম্মত ধারার অস্তিত্ব ছিল। লক্ষ্যণীয় চার্বাক-চড়ক-সুশ্রুতের ম মুণি ঋষিদের গোষ্ঠী যারা বস্তুভিত্তিক দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যিকারের অবদান রেখে গেছেন (পরে তাদের অবদানকে অলৌকিকতা, ঈশ্বরবাদ, রহস্যবাদ দ্বারা যতই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন করা হোক না কেন)। এটা ভাবতে অবাক লাগে যেখানে চার্বাক গোষ্ঠী সভ্যতার ঊষাকালে "প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই, প্রমাণ ভিন্ন জ্ঞান নাই" এই বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন, সেখানে প্রাচীন ভারতের

মহাকাশ গবেষণার রোজনামচা ঃ

চাঁদের 'অন্ধকার' পৃষ্ঠে অবতরণ করল চ্যাং - ৪

– জন হায়দার

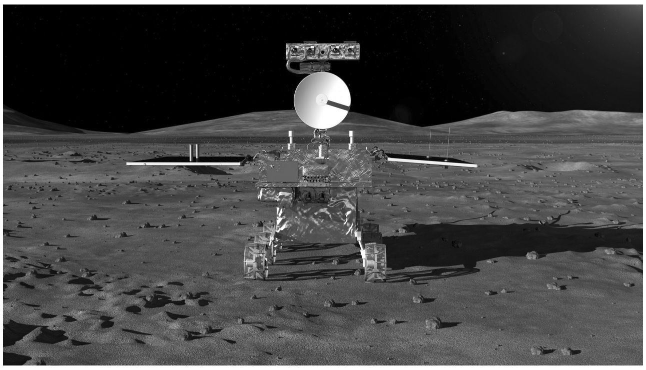

গত ৩রা জানুয়ারি, ২০১৯ চীনা সময় সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ চীনা রোবটিক মহাকাশযান চ্যাং-৪, চাঁদের অপর পৃষ্ঠে বা 'অন্ধকার' পৃষ্ঠে অবতরণ করেছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা ব'লে বিশ্বের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেছেন। এর বহু পূর্বে সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা-৩ চাঁদের কক্ষপথে ঘূর্নণের সময় প্রথমবার ঐ পৃষ্ঠের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ তার নিজের অক্ষে একবার ঘূর্ণন সম্পূর্ণ করতে যত সময় নেয় ঐ একই সময়ে সে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই ঘটনাকে 'টাইডাল লকিং' বলে। এর ফলে পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময়ে চাঁদের একটি মাত্র পৃষ্ঠই দৃষ্টগোচর হয়ে থাকে। অন্য পৃষ্ঠটি কখনই পৃথিবী থেকে দেখা সম্ভব নয়। তাই ঐ পৃষ্ঠকে 'অন্ধকার' পৃষ্ঠ বলা হয়। এখানে 'অন্ধকার' শব্দটিকে আলোর অভাব জনিত অন্ধকার বোঝানো হচ্ছে না। বলা হচ্ছে অজ্ঞানতা জনিত অন্ধকার। আসলে পৃথিবী থেকে চাঁদের কেবলমাত্র সম্মুখ পৃষ্ঠটি দেখা গেলেও, চাঁদের সমগ্র উপরতলেই সূর্যকিরণ আপতিত হয়। ভরা পূর্ণিমার পৃথিবী থেকে সর্বাধিক আলোকিত অংশ (প্রায় ৫৯%) দৃষ্টিগোচর হতে পারে। অন্যদিকে, পৃথিবী থেকে সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের অপর পৃষ্ঠ সর্বাধিক আলোকিত থাকে। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান আলোকিত অংশের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত এই দু-সপ্তাহ ব্যাপী চাঁদের দৃশ্যমান আলোকিত অংশের পরিমাণ ৫৯ শতাংশ হতে হ্রাস পেতে পেতে শূন্য শতাংশে পৌছায়। এই দু সপ্তাহ ব্যাপী সময়টিকে কৃষ্ণপক্ষ বলা হয়। অন্যদিকে, অমাবস্যা হতে পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত দু

➔

● *বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রা*

গৌরব তুলে ধরার নামে সেই গৌরবজ্জ্বল অতীতকেই ম্লান করে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় চিন্তার যে সংকীর্ণ গোষ্ঠী অলৌকিকতাবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী তত্ত্বের দ্বারা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করেছিল তাদেরই উত্থাপন করা হচ্ছে মূল ধারা হিসাবে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে একই প্রয়াস অন্যান্য দেশগুলিতে ইসলামবাদী, খৃষ্টানবাদী শাসক গোষ্ঠী করে যাচ্ছে। প্রতিটি দেশে ঘটে চলা সরকারের এই সমস্ত বিজ্ঞান বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার পথে বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছেন বিশ্বের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। অবশ্য প্রতিটি দেশে ও রাজ্যের ক্ষেত্রে এই প্রধান তিনটি বিষয়ের সঙ্গে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেদের আশু সমস্যাগুলি তুলে ধরছেন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান সংগঠন এবং ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপকগণ। যেমন ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে ৪ঠা মে বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রায় ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ ম্যালেরিয়া নির্মূলিকরণ নীতি, সরকারী দায়িত্বে প্রত্যেক বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, সাফাই কর্মীদের নিরাপত্তার মত আশু জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় তুলে ধরেছে। একই সঙ্গে ভূমিকম্প প্রবণ এই রাজ্যে ভূমিকম্প থেকে আগাম সতর্কতা, সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও শিক্ষার পরিকাঠামোর দাবী তুলেছে সংগঠন।■

সপ্তাহ কাল ব্যাপী সময়ে চাঁদের দৃশ্যমান আলোকিত অংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে আবার ৫৯ শতাংশে পৌছায়। এই সময়কালকে শুক্লপক্ষ বলে।

যাই হোক, চাঁদের সম্মুখ পৃষ্ঠের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ বেশি থাকলেও পরবর্তীকালে চাঁদের অপর পৃষ্ঠের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ২০১৮ সালের ৭ই ডিসেম্বর চ্যাং-৪ চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে প্রথমে চাঁদের পক্ষপথে আবর্তন করে ও ক্রমশঃ উচ্চতার হ্রাস ঘটিয়ে ২০১৯ সালের ৩রা জানুয়ারী চাঁদের মাটিতে মৃদু অবতরণ করে। কিন্তু সমস্যা হল চাঁদের দূরবর্তী পৃষ্ঠ হতে পৃথিবীতে সংকেত পাঠানো হবে কি ভাবে? ঐ স্থান থেকে সংকেত পাঠালে সে তো মহাকাশে হারিয়ে যাবে, পৃথিবীতে এসে পৌঁছবে না। এই সমস্যা বিজ্ঞানীদের পূর্বেই জানা ছিল, তাই এর সমাধানও আগেই ভাবা ছিল। সংকেত আদান-প্রদানের জন্য বিজ্ঞানীরা মহাকাশে ঘূর্ননরত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করেছিলেন।

চ্যা-৪-এর চন্দ্রপৃষ্ঠের যে স্থানে অবতরণ করে সেটি হল দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের আটকেন বেসিন অঞ্চল। এরপর, চ্যাং-৪-এর রোভার ভন কারমান খাদ ঘুরে বেড়াবে ও তথ্য সংগ্রহ করবে। এখানে উল্লেখ যে, এই ভন কারমান খাদ কেবলমাত্র চন্দ্রপৃষ্ঠের গভীরতম খাদ এমন নয়, এটি আমাদের সৌরজগতের মধ্যে গভীরতম খাদ। এই খাদের নিম্নবিন্দু থেকে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় ১৫ কিমি, যা এভারেস্টের উচ্চতার প্রায় দ্বিগুণ।

এই অভিযানে চাঁদের গুরুমন্ডল এবং লঘুমন্ডলের উপাদান, গঠন ইত্যাদি পরীক্ষা করার পাশাপাশি মহাজাগতিক রশ্মি, সূর্যের জ্যোতির্বলয়, রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে বিভিন্ন মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণ করবে চ্যাং-৪। এই অভিযানে আরও একটি মজার ঘটনা ঘটাতে চলেছে বিজ্ঞানীরা। চন্দ্রপৃষ্ঠে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে একটি ছোট মাপের ফুল ও সজীর বাগান তৈরী করতে চাইছে বিজ্ঞানীরা। এর জন্য ছয়টি বিশেষ জাতের চারা গাছ নিয়ে যাওয়া হয়েছে পৃথিবী থেকে। এগুলির মধ্যে রয়েছে তুলা, আলু, রেপসীড, ইস্ট ও অ্যারাবিডপসিস নামে একটি ফুলের গাছ। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি সঠিক হয় তাহলে চাঁদের মাটিতে ফুল ফুটতে চলেছে।■

যে সব স্টলে পত্রিকা পাওয়া যাচ্ছে

* কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের মণিষা বুক স্টল
* কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের বইচিত্র বুক স্টল
* কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের বুক মার্ক
* কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের পিপলস বুক সোসাইটি
* কলকাতার রাসবিহারী মোড়ের স্টল
* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের স্টল
* বেহালা, সখের বাজার
* বেহালা, চৌরাস্তা
* বেহালা, ঠাকুরপুকুর ৩ এ বাস স্ট্যান্ড
* সোনারপুর স্টেশনের বুক স্টল ২ নং প্ল্যাটফর্ম
* বারুইপুর স্টেশনের বুক স্টল
* পাথর প্রতিমা বাজারের বুক স্টল
* আসানসোল কোর্ট মোড়ের বুক স্টল
* শিলিগুড়ি সেবক মোড়ের পত্রিকা স্টল
* শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে বিদিশা পেপার হাউস
* নবদ্বীপ পোড়ামাতলা বাজারের বুক স্টল

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরি রাম আহমেদ

তৃতীয় পর্ব

গ্যালিলিও ও কেপলার ছিলেন তাঁদের সময় কালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানব সমাজ গ্যালিলিওর হাত ধরে সেই সময়কার যে অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বিষয় আবিষ্কার করেছিল, তার ঐতিহাসিক উল্লেখ না করলে প্রকৃত অর্থে পরবর্তীকালের বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যেত। যদিও এই আবিষ্কার এখনও মানুষের সমাজে অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। টলেমী-আর্কিমিডিসের যুগে বিজ্ঞানের অনেক কিছু আবিষ্কার হলেও গ্যালিলিও বা কেপলারের অবদান ভিন্ন ধরনের। আর্কিমিডিসের উদ্‌স্থিতিবিদ্যা থেকে জানতে পারা গেল যে জল যদি শান্ত নিথর থাকে, তবে সে পাত্রের গায়ে কতটা চাপ দিতে পারবে। কিন্তু সেই জল যদি হয় বহমান নদীর জল, তাহলে কী হবে। সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সব কথার সার কথা এই যে এই মহাবিশ্বজগৎ যদি পরিবর্তনশীল গতিময় হয়ে থাকে, তবে তা কি কোনো এক বা একাধিক নিয়মে চলে? যে নিয়ম ঈশ্বরতত্ত্ব দিয়েছে, তা নয়। এই নিয়মকে প্রকৃতি থেকে আহরণ করতে হবে। এখান থেকেই প্রাকৃতিক জগতের সংরক্ষণ সূত্রের অনুসন্ধান শুরু করে মানুষ। আগেই বলেছি এই বিশেষ তাগিদ মানুষ ইতিহাসের এক বিশেষ কাল পর্যায়ে এসে শুরু করেছিল। এইভাবেই সংরক্ষণ সূত্রের আবির্ভাব ঘটে। সংরক্ষণ সূত্র হল এমন একটা সূত্র যাতে বলা হয় যে ‘অমুক জিনিসটা সংরক্ষিত’। তার মানে, জিনিসটা বদলাচ্ছে না, বাড়ছেও না বা কমছেও না। এমন কিছুর খোঁজ করার অর্থ হল মানুষ এবার প্রকৃতির নিয়ম (কোন এক সাপেক্ষ কাঠামোতে নয়, আরো বৃহত্তর বা তার অনুমেয় বৃহত্তম জগতে) আবিষ্কার করতে চাইছে।

গ্যালিলিওর সময়কাল থেকে আজকের একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা অনেকটা পথ চলে এসেছি। উৎপাদন তথা মানব সমাজ ইতিমধ্যে বহু ধারায় বিকশিত হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক মানব সমাজে মানব মনের অগ্রগতি এখনো বেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। মানুষের মানসিক বিকাশ, তার সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের পিছনে পিছনে চলেছে। এটাই সমাজ বিজ্ঞানের নিয়ম। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। গ্যালিলিওর হাত ধরে আমরা জেনে গেছি যে জগতের সবকিছুই সব সময় একরকম থাকে না। তার গতীয় অবস্থাকে সাপেক্ষকাঠামোর সাপেক্ষে বিবেচনা করতে হবে। সমগ্র মানব সমাজের মনন ধীর প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়ে চলেছে, যা তার অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সমন্বয় ঘটাবার দিকে এগিয়ে যাবে।

গ্যালিলিওর এই সাপেক্ষ কাঠামো ছিল জড় সাপেক্ষ কাঠামো। পরবর্তীকালে নিউটনও এমনই সাপেক্ষ কাঠামোকে ধরে গ্যালিলিওর ধারণা গণিতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু কোনো সাপেক্ষ কাঠামো নিজে যদি সমবেগে গতিশীল না হয়ে তার বেগের পরিবর্তন করে, তবে কি হবে, তা মানুষ ভাবতেই পারতো না। এটা বহুদিন পর্যন্ত চলেছে। সেই কারণে স্মরণ করুন, গ্যালিলিও বলছেন – জাহাজের গতি বাড়ানো বা কমানো যাবে না। তার দিক পরিবর্তনও করা যাবে না। (দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় পর্বে গ্যালিলিও-র উদাহরণ)

এমনই জড় সাপেক্ষ কাঠামোতে থাকা বস্তুজগতের গতি সরলরেখায় হতে পারে। আবার বক্ররেখায়ও হওয়া সম্ভব। যেমন আকাশের গ্রহ-উপগ্রহের গতিমুখ সরল নয় – বক্র। কেপলার এমন বাঁকা পথে চলা বস্তুর আবর্তন পথের ধারণা দিয়েছিলেন। এমন আবর্তন পথের ক্ষেত্রফলও তিনি নির্ণয় করেছিলেন। যেমন বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়। মনে রাখার বিষয়, সে সময় ক্যালকুলাসের আবিষ্কার হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি সূর্যকে প্রদক্ষিনরত পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ক্ষেত্রফলও নির্ণয় করেছিলেন। কেপলারের কল্পনায় নীচে আঁকা ছবিতে ‘S’ হল সূর্যের অবস্থান (সূর্যের কেন্দ্র, নিখুঁতভাবে বললে)। ‘S’ কে ঘিরে ধরা যাক পৃথিবী ঘুরে চলেছে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে। যখন

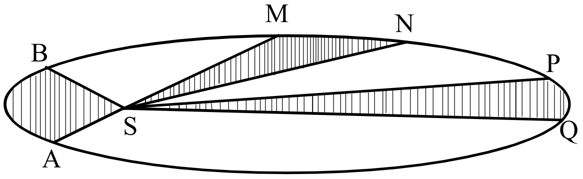

পৃথিবী সূর্যের নিকটতম, তখন তার অবস্থান A থেকে B, যখন পৃথিবী সূর্যের দূরতম, তখন তার অবস্থান P থেকে Q।

কেপলার যেহেতু উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা জানতেন। তাই ক্ষেত্রফল ABS এবং PQS উভয়ই তিনি নির্ণয় করলেন।

এমনকী এদের মধ্যবর্তী যেকোন ক্ষেত্রফল (MNS)-ও তিনি নির্ণয় করলেন। যদি A থেকে B তে যেতে, M থেকে N-এ যেতে এবং P থেকে Q তে যেতে একই সময় লাগে। তবে ABS ক্ষেত্রফল = MNS ক্ষেত্রফল = PQS ক্ষেত্রফল হবে। এই ব্যাপারটা কেপলার আবিষ্কার করেছিলেন। এটা একটা মানুষের আবিষ্কার করা সংরক্ষণ সূত্র। সম্ভবত প্রথম আবিষ্কৃত সংরক্ষণ সূত্র। এই সংরক্ষণ সূত্র আবিষ্কার করে কেপলার মহাবিশ্বের নিয়ম অন্বেষণে মাইল ফলক হয়ে গেলেন।

কেপলারের মৃত্যু হয়েছিল ১৫ই নভেম্বর ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে। গ্যালিলিও তার পরে আরো বারো বছর বেঁচেছিলেন। গ্যালিলিওর মৃত্যুর প্রায় একবছর পর ইংলন্ডে আইজ্যাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সময়কালটা এই জন্যই আবার উল্লেখ করলাম, কারণ এই কালপর্যায় একের মধ্যে অন্যকিছুর বেড়ে ওঠার সময়কাল। এই সময় সামন্ত উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে পুঁজিবাদের ভ্রূণ বিকশিত হওয়ার সময়কাল। আমরা বলেছিলাম সামন্ততন্ত্রের গর্ভে পুঁজিবাদের বিকাশ। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সন্তানের দেখা না পেলেও তার অস্তিত্ব আমরা টের পাই। গর্ভের শিশু কিন্তু সর্বতোভাবে ভবিষ্যতে জন্ম নেওয়া শিশুর অবিকলরূপ নয়। অনেক পার্থক্যও থাকে। আবার থাকে মিলও। এই মিল দেখে তাদের পারস্পরিক গতিশীল অবিচ্ছিন্নতা আমরা বুঝতে পারি।

মানবসমাজের ক্ষেত্রে এই বিষয়কে সমাজ বিজ্ঞানী কার্ল মার্কস কিভাবে দেখেছিলেন? বিশেষ করে এই কাল পর্যায়ের উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশকে কিভাবে দেখেছিলেন? মার্কস লিখেছিলেন – "পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সামন্ত সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই বেড়ে উঠেছিল। সামন্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর বিলুপ্তি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর উপাদানগুলিকে মুক্ত করে দিয়েছিল।" (দ্রষ্টব্য ক্যাপিটাল, প্রথম খন্ড)

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে কৃষকরা থাকতো জমির সাথে বাঁধা। আর সেই সময়ই বাজারে কুটির শিল্পীদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হত বিনিময়ের প্রয়োজনে। মুক্ত বণিকরা এক পণ্যের বিনিময় অন্য পণ্যের বাণিজ্য চালাতো। পরে মুদ্রার প্রচলন হল। তখন বিনিময়ের চক্র হয়ে ছিল 'পণ্য-মুদ্রা-ভিন্ন পণ্য' – এমন চলতে থাকলো। জমি থেকে উৎপাদিত ফসল ছিল ভূদাসদের অন্নসংস্থানের জন্য এবং সামন্তপ্রভুদের বিনাশ্রমে ভোগের জন্য। বাজারে বিক্রি হওয়া পণ্য কিন্তু সঞ্চালিত হত দুই বিপরীত পণ্যের দুপক্ষে থাকা ব্যক্তিদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক এই অর্থনৈতিক কাঠামোতে এমন একটা শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল যে কিন্তু উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন,

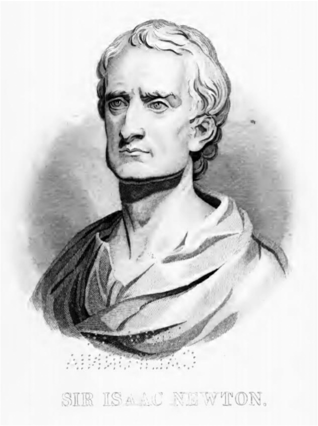

আইজাক নিউটন

অথচ উৎপাদনকে উভয়দিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর নাম বণিকশ্রেণী। এদের হাতে পণ্য বিনিময়ের ফলে মুদ্রাসঞ্চিত হচ্ছিল, এবং তা এই পরিমাণে বেড়ে গেছিল যে মুদ্রা ব্যবহার করে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করছিল। সঞ্চিত মুদ্রা ক্ষুদ্র উৎপাদনকে বিকশিত করেছিল এই মাত্রায় যে তার ফলে উৎপাদনের কাঁচামাল সরবরাহ করতে গিয়ে ইংলন্ডে সামন্ত ভূস্বামীরা তাদের জমি থেকে ভূদাসদের উচ্ছেদ করে মেষপালনের মতো লাভজনক কাজে উৎসাহিত হল। ফলে সেখানে ভূদাসরা উচ্ছেদ হল। অন্যদিকে উচ্ছেদ হয়ে তারা হল জমি থেকে মুক্ত। সামন্তশ্রেণীও তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারাল। আর সব থেকে বিশেষ ব্যপার এই যে বণিকশ্রেণী এতটাই শক্তিশালী হতে থাকল যে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অবস্থায় পৌঁছাল। এক কথায় বললে সামন্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো পূরানো সামন্ত-অর্থনীতি নয়। আবার তাকে পুঁজিবাদও বলা চলে না। মাতৃগর্ভের ভ্রূণ যেমন জন্ম নেওয়া শিশুটির থেকে অনেক বিষয়ে আলাদা – তেমনই। গ্যালিলিওর মৃত্যু আর তার প্রায় এক বছর পর নিউটনের জন্ম হয় মানব ইতিহাসের এমনই সন্ধিক্ষণে।

নিউটন জীবনের শেষে এসে বলেছিলেন – 'If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants." অর্থাৎ 'আমি যদি কিছু দেখে থাকি, তা দেখেছি আমার অগ্রজ সব বিরাটমাপের মহান ব্যক্তিদের কাঁধে চড়ে।' তাই নিউটন যখন শৈশব থেকে কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ করছেন, তখন তাঁর চারপাশে থাকা সমসাময়িক সেই সমস্ত অগ্রজদের বিষয় আলোচনায় এবার আসা যাক।

উইলিয়াম হার্ভে

নিউটনের সমকালীন বা তার অনতিপূর্বের বিজ্ঞানীদের প্রভাব ঃ

আগেই বলেছিলাম, গ্যালিলিওর মৃত্যুর পর, তাঁর ভাবনা-চিন্তা বিদেশে ছড়িয়ে পরেছিল। তাঁকে গৃহবন্দী করে, নতুন ভাবনাকে রোখা যায় নি। কারণ নতুন ভাবনার দর্শন সমাজের অভ্যন্তর থেকেই এসেছে। গ্যালিলিওর যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ভাবনার দার্শনিক মূল ছিল এটাই যে, জগতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল। তাই কোন কিছুই নিরপেক্ষ নয়, সব কিছুই সাপেক্ষিক। তাঁর সাপেক্ষকাঠামো বা রেফারেন্স ফ্রেমের ধারণা তুলে ধরেছে যে 'সত্য' বলে এতকালের পরিচিত ধ্রুব ধারণাও সাপেক্ষিক। অর্থাৎ স্থির নয়। এখন থেকে পদ্ধতিগতভাবে এরকম ভাবতে শিখে গেছি আমরা। এভাবে ভাবা অনেক আগে মানব সমাজে অসম্ভব ছিল। এই দার্শনিক চিন্তা তাই এযুগে ছড়িয়ে গেছে স্বাভাবিক নিয়মে। কোনোভাবে তাকে রুখে দেওয়া যায় নি। গ্যালিলিওর ভাবনা চিন্তা তাঁর অনুরাগী, ছাত্ররা বিদেশে নিয়ে গেছিল।

এই সময়কালে ইংলন্ডে সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি রাজাকে সর্বোচ্চ পদে রেখে পুঁজিপতিশ্রেণী আপোষের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতায় থাকার নীতি গ্রহণ করেছিল। আবার এই আপোষ নীতির বিরোধী অংশও ছিল। এটা সেই অন্তবর্তী পর্যায়, যখন সামন্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর বিলোপ ঘটছে, ফলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর উপাদানগুলিও মুক্তি চাইছে। এই দোটানায় উইলিয়াম হার্ভে নামক এক জীববিজ্ঞানীর আগমন ঘটল ইংলন্ডে। উইলিয়াম হার্ভের আগে মানুষের ধারণা ছিল যে যকৃতে রক্ত তৈরী হয়। তিনি 'অ্যান অ্যানাটমিকাল এক্সারসাইজ অন দ্য মোশন অফ দ্য হার্ট অ্যান্ড ব্লাড ইন অ্যানিমালস্' – নামক একটি গ্রন্থ লেখেন। তিনি প্রাণীদেহ ব্যবচ্ছেদ করে যা পেয়েছিলেন, সেই প্রাপ্ত জ্ঞান থেকে এই বই লেখেন। মনে রাখার দরকার যে মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ ধর্মীয় ভাবে নিষিদ্ধ থাকলেও একাজ তিনি ও তাঁর মতো বিজ্ঞানীরা করেছিলেন। আর সেই কারণেই ঐ বইটি লেখা সম্ভব হয়েছিল। আগে মানুষের ধারণা ছিল ধমনীতে যে রক্ত সঞ্চালিত হয় তার উৎস হৃৎপিন্ড, আর শিরায় থাকা রক্তের উৎস যকৃত। ইউলিয়াম হার্ভে দেখান ফুসফুসীয় ধমনীর গোড়া এবং মহাধমনীর গোড়া দেখে বোঝা যায় হৃৎপিন্ড থেকে রক্ত দুটো ভিন্ন পথে চলাচল করে। একই রক্ত বারবার হৃৎপিন্ড দিয়ে চলাচল করে ধমনী ও শিরার মাধ্যমে।

উইলিয়াম হার্ভের সময়কালে অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। এইসময় হার্ভে মন্তব্য করেছিলেন –

'শরীরের কাছে হৃৎপিন্ডের যে স্থান, রাজত্বের কাছে রাজারও সেই স্থান।'

জীবদেহের বাইরের জগৎ সম্পর্কে মানুষের নিরন্তর গবেষণা, বারবার সেই দিকেই ঠেলে দিচ্ছিল যে এই বিশ্বজগৎ সদা গতিশীল এক বিশ্বজগৎ। কিন্তু সেখানে জীব দেহ, বিশেষ করে প্রাণীজগতের আভ্যন্তরীণ রূপ কেমন ? –

এই প্রশ্ন মানুষের শুরু থেকেই ছিল। দেহের ভিতর আত্মার যতক্ষণ বাস, ততক্ষণ সে জীবিত। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে সে জড়পদার্থ। কারণ সে নড়াচড়া করে না। খ্রীষ্ট বা ইসলাম মতে আবার মৃত মানুষ আসলে ঘুমিয়ে থাকেন কবরে ঈশ্বরের অনন্ত অপেক্ষায়। সেই সর্বশক্তিমানকে মেনে নিলে প্রাণীদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখা অনুচিত কাজ। তাই ধর্মে দেহ ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই সময়কার জীববিজ্ঞানীরা এই নিষেধ মেনে নেন নি। হার্ভে তাদের মধ্যকার একজন। তাঁর এই আবিষ্কার তাই সম্যক জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত। সামাজিক অবস্থা পরিপক্ক না হলে দার্শনিকদের ধারণা গ্রহণযোগ্য হয় না। হার্ভের বইতে হৃৎপিন্ডের চেহারা, তার কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক উঠলেও তা অনেকেই মেনে নিল। অথচ এর বহু বছর আগে আরবের চিকিৎসক ইবন আল নাদি একই ধরণের তত্ব উপস্থাপনা করে মহাবিপদে পড়েছিলেন। কেউ তাঁর কথা মেনে নেয়নি। অপেক্ষাকৃত উন্নততর সমাজের উন্নততর সামাজিক চিন্তার সাথে এবার হার্ভের ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ হল।

হার্ভে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে অনুসন্ধান করে দেখলেন যে শুক্রানু ও

ডিম্বানুর মিলনে নতুন জীবের একক গড়ে ওঠে। তখনো মানুষের কোষ সম্পর্কিত ধারণা ছিল না। তবু সে সময়ই তিনি এমন ধারণা করেছিলেন।

আপাতভাবে উইলিয়াম হার্ভের এই গবেষণা সাধারণ মনে হলেও প্রচলিত ধারণা থেকে সরে আসার চিন্তা ছিল তাঁর গবেষণায়। যে হৃৎস্পন্দন শুনে প্রাণের অস্তিত্ব মানুষ অনুভব করে সেই হৃৎস্পন্দন যে হৃৎপিন্ড থেকে আসছে, তার গঠন ও কার্যকলাপের সম্যক জ্ঞান জীবনকে বস্তুগত ক্রিয়াকলাপের ফল হিসাবে দেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই সাহায্যকারী হল। আবার নিষেক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর ধারণা এই জীবন সৃষ্টি হওয়ার কাল্পনিক ধারণার মূলে আঘাত হানলো।

কোষের আবিষ্কার করেছিলেন অনেক পরে ইংলন্ডেরই এক বিজ্ঞানী রবার্ট হুক। তিনি নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু রবার্ট হুকের 'কোষ' আবিষ্কার হত না, যদি না অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হত। গ্যালিলিওর হাত ধরে আমরা খালি চোখে

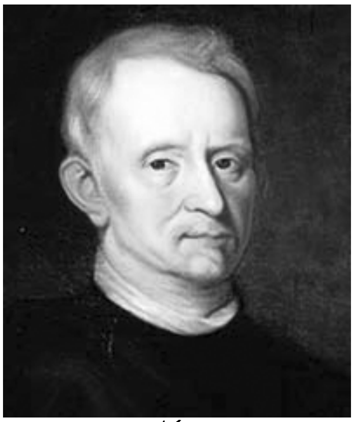

রবার্ট হুক

যতদূর দেখা যায় তার থেকেও দূরে থাকা জগৎকে দেখেছি। অন্যদিকে খালিচোখে দেখা যায় না যে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জগৎ তাকে জানার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার দরকারি ছিল। কোষের আবিষ্কারও সম্ভব হত না।

এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ার আগেই বিবর্ধক কাঁচের ব্যবহার ছিল। বণিকরা কাপড়ের একক ক্ষেত্রফলে সূতার সংখ্যা পরিমাপ করে তার গুণমান নির্ধারণ করতেন। এই কাজ আমরা হাতের আঙুলের মাঝে কাপড় রেখে ঘষে বুঝে থাকি। সে সময় আন্তন ভন লিউয়েনহক নামের এক উঠতি ব্যবসায়ী, অনেকের মতোই কাপড়ে সূতার পরিমাণ বোঝার জন্য বিবর্ধক কাঁচ (ম্যাগনিফাইং গ্লাস) ব্যবহার করতেন। এই কাজ করতে গিয়েই তাঁর মাথায় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভাবনাটা আসে। তিনি

আন্তন ভন লিউয়েনহক

সারাজীবনে ৫০০-র বেশি অনুবীক্ষণ যন্ত্র বানিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি মৌমাছির হুলের মতো অতি সূক্ষ্ম বস্তু (যা খালিচোখে দেখা যায় না) দেখতে পেলেন। সেগুলো আবার তিনি অতি উৎসাহে লিপীবদ্ধ করলেন। তিনি সেই চিত্রগুলো ইংলন্ডের রয়াল সোসাইটিতে পাঠিয়েও দিলেন।

লিউয়েনহকের এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে উইলিয়াম হার্ভের রক্ত তৈরী হওয়া সংক্রান্ত ধারণার ত্রুটি সংশোধন হল। একাজ কিন্তু করলেন গ্যালিলিওরই এক ছাত্র জিয়োভান্নি বোরেলি এবং মার্সেলো ম্যালপিজি নামক দুই ইতালীয় যুবক। তাঁরা একত্রে দেখালেন হার্ভের রক্ত সংবহন সংক্রান্ত তত্ব অসম্পূর্ণ। হার্ভে কৈশিক ঝিল্লি বা ক্যাপিলারির অস্তিত্ব বুঝতে পারেন নি। এই দুই নবীন বিজ্ঞানী অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সূক্ষ্ম ক্যাপিলারি জালিকা পর্যক্ষেণ করলেন। লিউয়েনহক ভালো ছবি আঁকতে জানতেন না। তাই তাঁকে আর্টিস্টের সাহায্য নিতে হয়েছিল। যদিও তাঁর হাত ধরে মানুষের দৃষ্টি সূক্ষ্মতর হয়েছিল। এক মিলিমিটারের অর্ধেক মাপের স্থলে মানুষ এখন মৌমাছির হুলের মত সূক্ষ্ম বস্তুকে বেশ বড়সড় আকারে দেখতে পেল।

কিন্তু নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী রবার্ট হুক ছিলেন দক্ষ চিত্রশিল্পী। তাই তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে যা দেখতেন, তা সুন্দরভাবে এঁকে ফেলতে পারতেন। একটুকরো কর্কের প্রস্থচ্ছেদকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেলে তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন প্রকষ্ট সদৃশ কিছু। সেগুলোর বারংবার উপস্থিতি তিনি দেখলেন। এগুলোকে তিনি জীবজগতের একক (Unit) হিসাবে গণ্য করলেন। এরই নাম দিলেন কোষ (cell)। তিনি মনে করতেন জীবজগতের বিল্ডিংব্লক এই কোষ।

কোষের আবিষ্কর্তা রবার্ট হুক যাঁর হাত ধরে বিজ্ঞানের জগতে পদার্পণ করেন, তিনি গ্যালিলিওর অনুরাগী আইরিশ বিজ্ঞানী

রবার্ট বয়েল

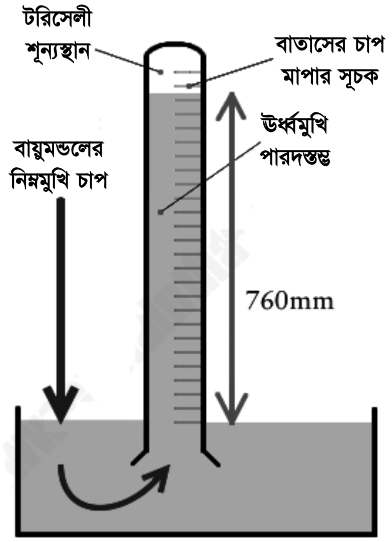

ব্যারোমিটারের কার্যনীতি

রবার্ট বয়েল। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তাঁর জন্ম হয়। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যান। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর গৃহশিক্ষকের সাথে ইতালীতে পৌঁছন। সে সময় গ্যালিলিও জীবিত। গ্যালিলিওর মৃত্যুকালীন সময় তিনি ফ্লোরেন্সে ছিলেন। গ্যালিলিওর প্রতি চার্চের অন্যায় আচরণ বয়েলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি ক্রমশ গ্যালিলিওর দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বয়েল ইংলন্ডের অক্সফোর্ডে বসবাস শুরু করলেন। তিনি তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধুদের সাথে লন্ডনের গ্রেসাম কলেজে সপ্তাহের শেষে মিলিত হতেন। সেখানে সমসাময়িক জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা চলতো। অবশেষে তারা একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। এটিই ভবিষ্যতে বিখ্যাত রয়াল সোসাইটিতে পরিণত হয়েছিল।

অ্যারিস্টটলের মতে কোথাও কোনো বায়ুশূন্যস্থান থাকা সম্ভব নয়। এমন ধারণার দার্শনিক ভিত্তি এই যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হলেই তা পূর্ণকরার প্রাকৃতিক তাগিদ দেখা দেবে, তাঁর স্থির বিশ্বের ধারণায় পরবে আঘাত। অ্যারিস্টটলের যুগের বিচারে মানুষ এর বেশি ভাবতে পারতো না। যদিও আমরা দেখিয়েছি অ্যারিস্টটল নিজে এক জায়গায় থাকতে পারেন নি।

এই ধারণাকে খন্ডনের জন্য জার্মান বিজ্ঞানী গুয়েরিকের প্রচেষ্টায় বয়েল খুব উৎসাহ পেলেন। নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী রবার্ট হুক, রবার্ট বয়েলের সহকারী হিসাবে কাজে লাগেন ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। তাঁরা ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একসাথে কাজ করেছেন। এই পর্যায়ে তাঁরা একত্রে, একটি পাত্রকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য করে দিতে সক্ষম হন। অন্তত তাঁদের ধারণা এমনই ছিল। চারিদিক দিয়ে আবদ্ধ কাঁচের মধ্যে তরল পারদ ধাতুর ব্যবহার করে থার্মোমিটার যন্ত্র এবার আবিস্কৃত হল। একাজ করলেন বরার্ট বয়েল। তাঁর ধারণা ছিল যে ঐ সরু কাঁচ নলের মধ্যে তরল পারদ ছাড়া বাকি অংশটা শূন্য থাকা সম্ভব। এই ধারণার অন্যতম কারণ – গ্যালিলিওর সমসাময়িক ইতালীয় বিজ্ঞানী টরিসেলীর আবিস্কৃত বায়ুর চাপ মাপন যন্ত্র ব্যারোমিটার। গ্যালিলিও'র গুণমুগ্ধ বিজ্ঞানী টরিসেলী মনে করতেন যে এই পৃথিবীর সকল জীব এক বিশাল বায়ু সমুদ্রে নিমজ্জিত। তার ফলে পাখীর আকাশে ওড়ার অর্থ, বায়ু সমুদ্রে তাদের সন্তরণের সমার্থক। এই বায়ুর চাপ মাপতে গিয়ে তিনি একটি পারদে পরিপূর্ণ কাঁচ নলের মুখে আঙুল দিয়ে বন্ধ করে অপর একটি পারদপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে নল থেকে আঙুল সরিয়ে নেন। ফলে পারদপূর্ণ নল থেকে কিছুটা পারদ নেমে গেলেও পুরো খালি হল না। কারণ পারদপূর্ণ পাত্রের উপর বায়ু যে চাপ সৃষ্টি করছে, তা পাত্রের পারদ হয়ে নলে থাকা পারদস্তম্ভের উপর উর্দ্ধমুখী ক্রিয়া করে। বাতাসের চাপ বাড়লে নলের পারদস্তম্ভ উর্দ্ধমুখী হয়। বিপরীত ঘটনায় বিপরীত অভিমুখে পারদস্তম্ভ নেমে যায়। এই নীতির উপরে ভিত্তি করেই ব্যারোমিটার কাজ করে। এখানে যে ঘটনাটা নজরে পড়ার, যে কাঁচনলের পারদ নীচের দিকে নেমে গেলে, সেই স্থান শূন্যই মনে হয়। সেই ধারণাই কাজ করেছে থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে। থার্মোমিটারে পারদ উষ্ণতা হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে নীচে নামে কিংবা উপরে ওঠে। এখানেও ধারণা হয়, বাকি অংশে

নলটি বায়ুশূন্য। পরে জানা গেছিল যে থার্মোমিটারের আবদ্ধ কাঁচের মধ্যে পারদ বাষ্প থাকে, সেটা সম্পূর্ণত শূন্য নয়।

এই সময়কালে রবার্ট বয়েল কয়েকটি দারুণ পরীক্ষা করতে সক্ষম হন। যার প্রথমটা সেই অ্যারিস্টটলের বিরুদ্ধে গ্যালিলিওর পরীক্ষা। প্রায় বায়ুশূন্য কাঁচের একটি পাত্রে একটি পাখির পালক আর লোহার বলকে একসাথে উপর থেকে নীচে ফেলা হল। দেখা গেল বিনা বাধায় তারা একত্রে নীচে পড়ল। ভারি বস্তু আসলে অনেকগুলো হাল্কাবস্তুর যোগফল। একটা ভারি লোহার বল, যেন অনেকগুলো পাখীর পালক হয়ে একসাথে নীচে পরে। এখান থেকেই বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ খুঁজে বার করার ভাবনা পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্রতম অংশের ধারণা তখনও পর্যন্ত গ্রিকদের 'অ্যাটম' বা পরমাণুর ধারণা। গ্রিক ভাষায় 'অ্যাটম' কথার অর্থ অবিভাজ্য। অর্থাৎ যাকে আর ভাঙা যায় না। এটাও একধরণের স্থির বিশ্বের ধারণা। অ্যারিস্টটলের বিরোধিতা করলেও তখনো পর্যন্ত কালের সীমাবদ্ধতার জন্য মানুষ এমন ধারণা করেছে। আমরা যথাসময় দেখাবো অবিভাজ্য কণা স্বরূপ পরমাণু আরো ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি।

রবার্ট বয়েল দ্বিতীয় পরীক্ষায় দেখেন বায়ু শূন্যস্থানে ঘড়ি রাখলে তার কোনো শব্দ শোনা যায় না। অর্থাৎ শব্দ, যা কিনা মানুষের বিচারে শক্তি (তীব্র শব্দে যেমন পটকা ফাটলে জানালার কাঁচও ভেঙে যায়, ভূমিতে কম্পন হয়, অর্থাৎ কোনো না কোন যান্ত্রিক কাজ সম্পন্ন হয়। কাজের জন্য শক্তির প্রয়োজন এই ধারণা থেকে শব্দ শক্তির রূপ) – তা তরঙ্গ ছাড়া পরিব্যাপ্ত হয় না। তখনো পর্যন্ত মাধ্যম ব্যতিরেখে শক্তির প্রবাহ মানুষের ধারণায় ছিল না।

বয়েলের তৃতীয় পরীক্ষার ফলাফল আমরা স্কুলপাঠ্য বইতে পড়ে এসেছি। আমরা পড়েছি গ্যাসের তাপমাত্রা স্থির থাকলে তার আয়তন, তার উপর প্রযুক্ত চাপের সাথে ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্কে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ প্রযুক্ত চাপ বাড়লে গ্যাসের আয়তন কমে বা চাপ কমলে গ্যাসের আয়তন বাড়ে, যখন গ্যাসের উষ্ণতা নির্দিষ্ট থাকে। এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বয়েলের ধারণা হয় যে কোন গ্যাসে এমন কিছু পদার্থ বিদ্যমান যার জন্য তার এই সংকোচন ক্ষমতা আছে। বয়েলের ধারণা অনুসারে যেকোন গ্যাসের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষুদ্রতম পদার্থগুলির মধ্যবর্তী স্থলে ফাঁকা বা শূন্যস্থান আছে। এর আগে শূন্যস্থান নিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও করেছেন। চাপ প্রয়োগে সেই ক্ষুদ্র গ্যাসের কণাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে আয়তনে হ্রাস পায়। মনে রাখার বিষয়, উষ্ণতা স্থির রাখার কথা বলা হয়েছে। ক্ষুদ্রতম কণাগুলির ঘনসন্নিবিষ্টকরণ এক ধরণের যান্ত্রিক কাজ। কণাগুলির সরণ ঘটলে যে কাজ সম্পন্ন হয়, তার জন্য ব্যয়িত শক্তি, উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যদি না প্রতিটা প্রাথমিক কণায় তাপশোষক বা 'হিট সিঙ্ক' স্থাপন না করা হয়। এই সম্ভাব্য উৎপন্ন তাপের পরিমাণ এত অল্পমাত্রায় গণনা করা যেত না। তাই তাঁর মনে হত যে উষ্ণতা স্থির রেখে এই পরীক্ষা করা সম্ভব।

তৎকালীন সময়ের সাপেক্ষে মানুষের ধারণায় পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার ধারণা এমনই ছিল। বয়েলই প্রথম বুঝতে পারেন এমন বিভিন্ন প্রকার প্রাথমিক কণার মিলমিশ বা পৃথবীকরণ নতুন নতুন ধর্মের পদার্থের সৃষ্টি করে। অ্যারিস্টটলের ধারণায় ছিল জল, মাটি, আগুন আর হাওয়া দিয়ে মহাবিশ্ব গড়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই এই মতবাদের বিপরীতে মানুষের ধারণায় আসে যে এমন কিছু মৌলিক কণা আছে যা সবকিছুর ক্ষুদ্রতম। যা দিয়ে সব কিছু গড়া।

অনেকের ধারণায় পদার্থের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর ধারণা ভারতীয় দার্শনিকদের (যেমন কণাদ)। কিন্তু ভারতের বৈদিক দর্শন ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (শক্তি), মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (বা আকাশ) দিয়ে সমস্ত জগৎ গড়া এটা মনে করে। আজও বহুমানুষ তাই পাঠ করে আসছেন। বস্তুদিয়ে গড়া এই জগৎ যে ক্ষুদ্রতম কণার সমষ্টি এমন ধারণা তা নয়।

ইউরোপে বয়েলের এই ধারণার মধ্যদিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধারণার জন্ম হয়। যদিও এ সম্পর্কে তিনি খুব স্পষ্ট কোনো ধারণা দিতে পারেন নি। সেই কারণে 'রসায়ন' নামক বিজ্ঞানের শাখা, বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি তখনো। তখনো অ্যালকেমির ভোজবাজির মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন তাঁরা। রবার্ট বয়েল থেকে নিউটন সবাই এই অবিজ্ঞান থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

বরার্ট বয়েল আলো নিয়েও কিছু অসফল গবেষণা করেছেন। সবরকম শক্তির রূপের মতো আলো সম্পর্কেও আগ্রহ অনেক বিজ্ঞানীর মতো তাঁরও ছিল।

আমরা মোটামুটি সংক্ষিপ্তরূপে নিউটনের সমসাময়িক ও অনতিপূর্বের বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ধারণা-আবিষ্কার সম্পর্কে জানলাম। নিউটনের জন্ম হয় ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়কালের আগে ও সমসাময়িক পর্যায়ে যা কিছু বিজ্ঞানের জগতে ঘটেছে, তার সম্মিলিত প্রভাব নিউটনের উপর কিভাবে পড়েছিল, তা আমরা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব। না হলে বোঝা যাবে না নিউটনের সেই অমোঘ উক্তিটির মানে – **'আমি যদি কিছু দেখে থাকি, তা দেখেছি আমার অগ্রজ সব বিরাট মাপের মহান ব্যক্তিদের কাঁধে চড়ে।'** (ক্রমশ)

জানা-অজানা ঃ

দেশী খাদ্য বিদেশী খাদ্য

– রাজদীপ ঘোষ

আমাদের চারপাশের যে জগৎ যার মধ্যে গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, শহর-গ্রাম, কৃষিজমি, শিল্প, প্রাণীকূল, আকাশ-বাতাস, মাটি, আবহাওয়া, মহাকাশ-গ্রহ নক্ষত্র এবং মানব সমাজ সব কিছুই রয়েছে তাকে বলা হয় বস্তুজগৎ। এই বস্তুজগৎ পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে তারা বদলে যেতে থাকে। কখনো কোন বস্তুর পরিবর্তন হয় ধীর লয়ে-ক্রমাগত, কখনো এই ধারাবাহিক পরিবর্তনে ছেদ পড়ে – আচমকা, লাফ দিয়ে পরিবর্তন হয়। যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করে নতুন গুণবিশিষ্ট বস্তু, পুরনোটাকে প্রায় চেনাই যায় না।

সাধারণভাবে বস্তুর পরিবর্তনের নিয়মগুলোকে জানাই হল জ্ঞান। এর একটা মানে হল এই যে উপর থেকে দেখলে বিভিন্ন বস্তুর পরিবর্তন কে বিশৃঙ্খল, অগোছালো মনে হলেও আসলে তা নয়। বস্তু জগতের পরিবর্তনের নিয়মগুলোকে জেনে মানব সমাজের স্বার্থে ব্যবহার করাই হল প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান।

সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার প্রাথমিক কথাটা হল বস্তুর পরিবর্তনশীলতা অর্থাৎ কোন কিছুই যে অতীত থেকে আজ পর্যন্ত এবং আগামীতে একই রকম থাকেনা বা থাকবেনা তাকে স্বীকার করতে শেখা। মানব জীবনকালের সাপেক্ষে যে বস্তুর পরিবর্তন হয় দ্রুতগতিতে তা অনুসরণ করতে তেমন অসুবিধে হয় না। যেমন ধরা যাক প্রতি ২৪ ঘন্টায় দিন-রাত্রি এই কালচক্র খুব ছোট। সেটা অনুসরণ করা বা সেই অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু যদি এটা বলা হয় যে দিন-রাত্রির সৃষ্টি সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনের জন্য এবং এই সূর্য ক্রমাগত নিঃশেষ হবার দিকে যাচ্ছে – তখন তা অনুসরণ করাই প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখনই তৈরী হয় অজর-অমর-চিরকালীন-শাশ্বত এমন ধারণা। অথচ এটাই তো সত্য যে সূর্য এক সময় ছিল না। আবার চিরকাল থাকবেও না।

'অপরিবর্তনীয়' ধারণাই অবৈজ্ঞানিক। মানব সমাজ এর ক্ষেত্রে এই ধারণা থেকে সৃষ্টি হয় ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে আত্মগর্ব-আত্ম অহমিকা-শ্রেষ্ঠত্ব-উগ্রতা এবং অন্য ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি বিরূপতা-বিদ্বেষ-তাচ্ছিল্য-ঘৃণার ভাব। যা মানব সমাজের অগ্রগতির পথের বাধা হিসাবে ব্যবহার করা হয় বর্তমান সমাজের শাসকবর্গের দ্বারা।

কোন ভাষা ভিত্তিক জাতিগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের মধ্যেও এধরনের কিছু অপরিবর্তনীয় ধারণা গেঁথে দেওয়া হয়। যেমন ধরা যাক বাঙালী। সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা গঙ্গা অববাহিকায় বাস। মাছে-ভাতে মানুষ। অতি উচ্চ উন্নত সংস্কৃতি ধারণ করে। বুদ্ধিমান-প্রগতিশীল ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙালীর মধ্যে শ্রেণীবিভাজন বাদ দিলেও যদি বিচার করে দেখা হয় তবে বোঝা যাবে খাদ্যাভ্যাস-পোষাক-পরিচ্ছদ-পেশা-সংস্কৃতি এমনকি ভাষাটাও পরিবর্তনশীল। বর্তমানে গোটা বিশ্বজোড়া আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের কারণে কোন বিশিষ্টতাই, কোন বিশেষত্বই প্রায় অবশিষ্ট নেই। তবু আত্মপরিচয়কে 'অপরিবর্তনীয়' রূপে জোর করে ব্যবহার করানো হয় ভূয়ো গর্ব সৃষ্টি করে 'অন্য'র প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রয়োজনে।

২

আমরা সংক্ষেপে খাদ্যবস্তু উৎপাদন ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের বিষয়টাকে সামনে নিয়ে আসব। 'খাদ্যাভ্যাস' বা কোন খাবারের 'সৃষ্টিকর্তা আমি'-এ থেকেও সুক্ষ্ম আর স্থূল বিদ্বেষ, তাচ্ছিল্য সৃষ্টি করা যায়। সম্প্রতি রসগোল্লা কে আবিষ্কার করেছে বাঙালী না ওড়িয়া এমন তুচ্ছ আর অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়েও বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রয়াস রাখা হয়েছে একথা অনেকেরই স্মরণে থাকবে। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত খাদ্যাভ্যাস মূলতঃ ছিল স্থানীয় আঞ্চলিক বা দেশজ উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। স্থানীয় উৎপাদন ছিল প্রধানতঃ জলবায়ু-ভূপ্রকৃতি ও জৈব বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল। ভিন্ন অঞ্চল, ভিন্ন দেশের মধ্যে শস্য-বীজ ইত্যাদির আদান-প্রদানও ছিল ঢিমেতালে, ধীর গতিতে। অন্তর্মহাদেশীয় আদান-প্রদান প্রায় না থাকার মত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের অভিযানকেই ধরা হয় গাছপালা-প্রাণী-সংস্কৃতি এমনকি রোগ সংক্রমণ এর ক্ষেত্রে প্রথম বড় মাপের অন্তর্মহাদেশীয় বিনিময়। এরপর থেকে এবং বিশেষভাবে ইংলন্ড তথা পশ্চিম ইউরোপে

শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথে আঞ্চলিক-স্থানীয়-দেশজ উৎপাদন ও উপাদানগুলির দুনিয়াজোড়া আদান-প্রদান শুরু হয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। গত পাঁচশো বছরের মধ্যে শাক-সব্জি শস্য-বীজ সহ সকল খাদ্য উপকরণ তাদের আদি বাসস্থানে আটকে না থেকে দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে কৃষি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে, উন্নত-উচ্চ ফলনশীল রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রজাতির বীজ-শস্য-শাক-সব্জি-মাছ-মাংস উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। সহজলভ্যতা খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা বিদ্যমান সমাজে উৎপাদনের পিছনে চালিকা শক্তিরূপে মুনাফা এবং সে কারণে বিজ্ঞানের বিরাট উন্নতি, উৎপাদনশীলতার বিরাট বিকাশ সত্ত্বেও দুনিয়ার জন-সংখ্যার বিরাট অংশ যে ক্ষুধার্ত সেই প্রসঙ্গটাকে বাদ রাখবো। এবং খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনও যে বৃহৎ পুঁজিসংস্থার মুনাফার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেটাকেও বাদ রাখবো, অথবা বলা ভাল আগামী নিবন্ধের জন্য তুলে রাখবো।

যে উপাদানগুলো আজ আমাদের খাদ্যতালিকায় প্রায় অপরিহার্য সেগুলোর অনেকের সাথেই যে আমাদের পূর্বপুরুষদের পরিচয় পর্যন্ত ছিলনা তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখবো যে খাদ্য উৎপাদন, খাদ্যাভ্যাস কোন আদি, অনড়, নিজস্ব বিষয় নয়, ক্রম পরিবর্তনশীল।

৩

আলু

বলা যায় ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে খাদ্যতালিকায় আলু প্রায় অপরিহার্য্য, বহুল প্রচলনের কারণে মনে হয় গঙ্গাতীরের বাঙালী অথবা দেশভক্ত ভারতবাসী সুপ্রাচীন অতীতকাল থেকে আলু খেয়ে চলেছে। বিশেষতঃ যেখানে গোটা বিশ্বে আলু উৎপাদনে ভারত দ্বিতীয়। উৎপাদন ৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টন। (২০১৬-র হিসাব অনুযায়ী) প্রথম চীন।

আলুতে ভাত, রুটির মত শর্করা, আবার সব্জির মত তন্তু (ফাইবার) বিভিন্ন ভিটামিন, পটাসিয়াম সহ অন্যান্য খনিজ লবণ আছে। আলুর বর্তমানে ব্যবহৃত প্রজাতিগুলো অল্প আয়াসে প্রচুর ফলন দেয়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে মানানসই। যাকে আমরা বর্তমানে আলু বলছি আদিতে তার প্রায় ২০০ প্রকারের বন্য প্রজাতির খোঁজ পাওয়া গেছে। বর্তমানেও প্রায় এক হাজার প্রকারের আলু আছে, যার প্রায় ৯৯ শতাংশের উৎস হল দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের তুলনামূলক অখ্যাত দেশ চিলি থেকে। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতের সংলগ্ন অংশে চিলি, দক্ষিণ পেরু, উত্তর-পশ্চিম বলিভিয়ায় প্রায় সাত থেকে দশ হাজার বছর আগে স্থানীয় অধিবাসীরা আলুকে 'বন্য' অবস্থা থেকে গার্হস্থ্য কৃষি কাজে ব্যবহার করতে শুরু করেন। খ্রীষ্ট পূর্ব ২৫০০ অব্দে পেরুর ইন্‌কাদের সভ্যতায় আলু ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেলেও ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫৩২-১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ) স্পেনীয়দের দ্বারা পেরু বিজয়ের পূর্বে আলুর সাথে আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপীয়দের পরিচয় ছিল না। একথা লিপিবদ্ধ আছে যে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যান্ডে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ৪০,০০০ একর জমিতে আলু চাষ শুরু করেন। স্পেনীয়রা আলুকে 'পাতাতা', পর্তুগীজরা 'বাটাটা' ও ইংরেজরা 'পটাটো' বলে। ভারতে পর্তুগীজরা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আলু নিয়ে আসে যা পশ্চিম উপকূলে চাষ হত। মনে রাখতে হবে মারাঠীরা আলুকে 'বাটাটা' বলে। **ব্রিটিশ বণিকদের হাত ধরে বাংলায় 'পটাটো' এসে পৌঁছুয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।**

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকায় আলু কিন্তু পৌঁছেছিল ইউরোপ ঘুরে। আমেরিকায় বহুকাল পর্যন্ত একে ঘোড়ার উপযুক্ত খাদ্য মনে করা হত, আলুর পাতা ও গাছে বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতির জন্য। বর্তমানে ধান-গম আর ভুট্টার পর চতুর্থ বৃহত্তম ফসল আলু ইউরোপেও সহজে আর সাদরে গৃহীত হয়নি কারণ বাইবেলে আলুর কোন উল্লেখ ছিলনা। বেদ বা পুরাণেও আলুর উল্লেখ না থাকায় প্রাচীন হিন্দু মন্দিরগুলি যেমন পুরীর মন্দিরে জগন্নাথদেবের প্রসাদে আলু এখনও ব্রাত্য।

অতএব 'পটাটো' আলু কেবল আমার বা ওর নয় – সবার। প্রসঙ্গত এটা বলা প্রয়োজন যে মেটে আলুর আদি নিবাস কিন্তু ভারতসহ এশিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চল। আবার শাকালু বা শরবতী আলুর (নামে আলু হলেও এটি হল গাছের মূল আর পটাটো আলু হল মাটির নীচের কান্ড) আদি নিবাস হল মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা। সেখান থেকে চীন-ফিলিপিন্স হয়ে তা ভারতে এসেছে।

টমাটো এবং তেঁতুল

বর্তমানেও রাঢ় বাংলায় টমাটোকে বলা হয় 'বিলাতী'। পুরোটা হল 'বিলাতী বেগুন'। সুতরাং বয়োজ্যেষ্ঠরা জানেন টমাটো আসলে এদেশী নয়। আবার তাঁরা দেখেছেন টমাটো হয় শীতকালে। স্বাদে টক। বর্তমানে কাঁচা-রান্না করা সস্-স্যালাড – সারাবছর টমাটো ব্যবহার হয় অর্থাৎ উৎপাদনও

হয়। চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরই টমাটো উৎপাদনে ভারত তৃতীয়। (১ কোটি ৮৪ লক্ষ টন– ২০১৬ খ্রীঃ) দুনিয়ার ১১% ভারতে উৎপাদিত হয়।

টমাটোর আদি ভূমি হল মধ্য-দক্ষিণ আমেরিকা। ঠিক কবে থেকে গার্হস্থ্য কৃষিতে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে তা নিয়ে ভিন্ন মত থাকলেও খ্রীষ্ট পূর্ব ৫০০ অব্দে মেক্সিকোর আজটেকরা টমাটো চাষ করতেন। স্পেনীয়রা মধ্য আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের পরেই টমাটোর সাথে পরিচিত হয়। আজটেক ভাষায় 'tomati' থেকে স্প্যানীশ 'tomate' থেকে ইংরেজী 'tomato'। ষোড়শ শতাব্দীতে টমাটো ইউরোপে পদার্পণ করে (১৫২০ খ্রীঃ এর মধ্যে)। ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীতে প্রথম টমাটোর উল্লেখ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইংলন্ডে এটা ১৫৯০ খ্রীঃ। ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকায় ১৭১০ খ্রীঃ চাষের উল্লেখ থাকলেও ঐ একই 'বিষাক্ত' জ্ঞানে ১৮৩৫ খ্রীঃ অবধি আমেরিকায় ব্যাপক আকারে প্রচলিত ছিলনা। স্পেনীয়রা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামে বেশী পরিচিত), ফিলিপিন্স হয়ে এশিয়ায় টমাটোর যাত্রাপথে অনুঘটকের কাজ করেছিল। তবে ভারতে ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা টমাটো 'বহন' করে এনেছিল। ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে টমাটো গোটা বিশ্বে তার ঘাঁটি গাড়লেও সেই ষোড়শ শতাব্দীর টমাটোর কিন্তু প্রচুর রকমফের বিকশিত হয়েছে বিশেষতঃ মার্কিন মুলুকে।

বাঙালী তথা ভারতীয়দের রান্নায় টমাটোর আগে তার কাজটা করত **তেঁতুল** বা ট্যামারিন্ড। তেঁতুল এর আদি উৎস নির্ধারিত হয়েছে সুদান-ক্যামেরুন-নাইজিরিয়া-জাম্বিয়া ইত্যাদি ক্রান্তীয় আফ্রিকার দেশগুলি। এছাড়া আরবে বিশেষতঃ ওমান। কিন্তু ভারতে তেঁতুল খ্রীষ্টপূর্ব বহু শতাব্দী আগে থেকেই প্রচলিত। তাই এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় যে ভারতীয় উপমহাদেশই এর আদি বাসভূমি, সে না হোক তেঁতুল উৎপাদনে ভারত প্রথম।

বর্তমানে দুনিয়াজুড়ে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে তেঁতুল সব মহাদেশেই হয়। রান্নায় বহুল ব্যবহৃত। বিশেষভাবে মেক্সিকান রান্নায় ব্যবহৃত হয়। যা কিন্তু স্পেনীয় আর পর্তুগীজরা ষোড়শ শতাব্দীতে মেক্সিকোয় বহন করেছিল। অর্থাৎ যাত্রাপথটা এক মুখী নয়!

পেঁপে

বাঙালীর নিজস্ব রান্না শুক্তো, তার এক নিয়মিত উপাদান পেঁপে। পেটের সমস্যায় পেঁপের ঝোল! আর দুনিয়ার পেঁপে উৎপাদনের ৪৩% ই হয় ভারতে। (৫৭ লক্ষ টন – ২০১৬ খ্রীঃ)

কিন্তু তার আদি নিবাস মেক্সিকো, কোস্টারিকা ও সংলগ্ন মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাংশ ফ্লোরিডা-টেক্সাস থেকে শুরু করে বর্তমানে সমস্ত ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠান্ডার দেশে উৎপাদন হয় না।

ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে ১৫১৩-১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপীয়রা প্রথম পেঁপের সাথে পরিচিত হয়। স্পেনীয়দের হাত ধরে ফিলিপিন্স, সেখান থেকে মালয়েশিয়া হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়ায় পদার্পণ ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পরে। স্বাভাবিকভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর আগে তা পূর্ব ভারতে এসে পৌঁছয়নি।

মিষ্টি কুমড়ো

তুলনায় কম দামী ফল। ঠিকই ফল তবে সব্জি হিসাবে ব্যবহৃত। অথচ সুস্বাদু রান্না করা যায়। ভিটামিন A, B, পটাশিয়াম-আয়রণ ইত্যাদি খনিজ ও উচ্চ ফাইবার সমৃদ্ধ। কিন্তু কুমড়োর ছক্কাও প্রাচীন কাল কেন মধ্যযুগেও বাঙালী তথা ভারতীয়দের পাতে শোভা পেত না।

কুমড়ো হল স্কোয়াশ জাতীয় ফল যা সবথেকে আগে গার্হস্থ্য কৃষিকাজে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার আদি বন্য অবস্থা থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৭৫০০ অব্দের মধ্যে। মেক্সিকোর উত্তর-পূর্বাংশে আন্দিজ সংলগ্ন অঞ্চল এবং উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ অংশ এর আদি বাসভূমি। আমেরিকা কানাডায় এটি বহুল ব্যবহৃত এবং উৎসব সংস্কৃতির সাথেও সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। ইংরাজী পাম্পকিন এসেছে গ্রীক শব্দ পেপন থেকে। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জ্যাকুয়াস কার্তিয়ের উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স অঞ্চলে কুমড়ো খুঁজে পান, এটি ইংলন্ডে আসে ১৫৮৫-১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, ভারতে এটি পর্তুগীজদের হাত ধরেই এসেছিল। বস্তুতঃ কুমড়োর তামিল সংস্করণ হল 'পরঙ্গীকাই' যার অর্থই হল বিদেশী সব্জি। যাই হোক কুমড়ো উৎপাদনে ভারত ও চীন প্রথম দুটি স্থান অধিকার করে।

বাঁধাকপি

যাকে আমরা বাঁধাকপি (ক্যাবেজ) বলি বৈজ্ঞানিক হিসাবে তার বহু রকমফের আছে, সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত বাঁধাকপির আদি উৎস নিয়ে কিছুটা ভিন্নমত আছে। তবে এটা নিশ্চিত যে মহাদেশীয় ইউরোপ বা বর্তমানের ইংলন্ড অথবা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যেই রয়েছে এর আদি বাসভূমি। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে প্রচলিত ছিল। এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দেরও আগে এটি

গার্হস্থ্য কৃষিকাজে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকায় একটি স্কার্ভি প্রতিরোধী ও সমুদ্রযাত্রায় ব্যবহৃত হত। ফরাসী অভিযাত্রী জ্যাকুয়াস কার্তিয়ের দ্বারা এটি আমেরিকায় নিয়ে আসা হয় ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে। ১৭৭৫ পর্যন্ত জাপানে বাঁধাকপি প্রচলিত ছিলনা। সংস্কৃত ভাষায় বাঁধাকপির কোন নাম নেই। বাঁধাকপিও আদতে দক্ষিণ এশিয়ার (ভারত সমেত) বিভিন্ন প্রান্তে পর্তুগীজ দ্বারা আনীত।

কিন্তু স্বদেশী বিদেশী যাই হোক বর্তমানে চীনের পরই (দুনিয়ার উৎপাদনের ৪৭% হয় চীনে) বাঁধাকপি উৎপাদনে ভারতের স্থান। ২০১৬-র হিসাব অনুযায়ী ৯০ লক্ষ টন। সুতরাং কোন আক্ষেপ থাকা উচিৎ নয়!

ফুলকপি এবং ব্রকোলী

বাঁধাকপির সাথে এর অল্প জিনগত পার্থক্য আছে। ভূমধ্যসাগরের সাইপ্রাসকে এর আদি বাসভূমি বলে মনে করা হয়, এখান থেকে সে একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, তুরস্ক আবার ইতালি-স্পেন-ফ্রান্স এ গমন করে। ভারতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে সাহারানপুর (উত্তর প্রদেশ) এর কোম্পানী বাগ এর অধিকর্তা ডাঃ জেনসন দ্বারা আনীত হয়।

ফুলকপি, বাঁধাকপিরই এক তুতো ভাই ব্রকোলী। উৎস ইউরোপ – খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক। বন্য বাঁধাকপি থেকে নির্দিষ্টভাবে ইতালিতে এর জন্ম। কিন্তু ব্রকোলী অনেক ধীরগতিতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বা করছে। ইংলন্ডে অষ্টাদশ আর আমেরিকার বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক প্রচলন হয়। বর্তমানে চীন ও ভারতে ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়েছে।

কাঁচা লংকা

কাঁচা লংকা বা মরিচ বিনা রান্নার স্বাদ পান্‌সে। লংকারও বহু রকমফের আছে। কিন্তু ঝাল লংকার স্বাদের উৎস এক রাসায়নিক ‘capsaicin’। উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম, মনিপুর, মিজোরাম, সন্নিহিত বাংলাদেশের সিলেট (শ্রীহট্ট) প্রভৃতি জায়গায় উৎপাদন হয় দুনিয়ার সবচেয়ে ঝাল লংকা। ‘নাগা মরীচ’ ‘ভূত জলোকিয়া’, ‘বোম্বাই মরীচ’ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত এই লঙ্কাকে ১০+++ গ্রেড দেওয়া হয়েছে তার ঝালের তীব্রতার জন্য (২০০৭ খ্রীঃ)।

এহেন লংকাও আমাদের নয়, আদি নিবাস ক্রান্তীয় আমেরিকা মহাদেশ। ইকুয়েডরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ৫০০০ বছর আগে মরীচ এর চাষ হত। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল। ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রথম ক্যারীবিয় দ্বীপপুঞ্জে লংকার সংস্পর্শে আসেন। এবং তাঁর দ্বিতীয় অভিযাত্রায় সামিল চিকিৎসক আলভারেজ ১৪৯৩ সালে ঐ দ্বীপপুঞ্জ থেকে স্পেনে লংকা নিয়ে আসেন। স্পেনীয়দের থেকে ফিলিপিন্স সেখান থেকে চীন-কোরিয়া-জাপান-ভারতে লংকার সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়, বর্তমানে ক্রান্তীয় এশিয়া আর বিষুব আমেরিকায় সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। ভারত দুনিয়ার সর্বাধিক শুকনো লংকা উৎপাদন করে। (১৪ লক্ষ টন – ২০১৬ খ্রীঃ)

বস্তুতঃ ভারতীয় উপমহাদেশে লংকার পূর্বে ঝাল স্বাদের প্রয়োজনে গোল মরীচ বা কালী মির্চ (black pepper) এর ব্যবহার ছিল সুপ্রাচীন কাল থেকেই।

ডাল

ডাল জাতীয় শস্যের মধ্যে মুসুর ডালই হল প্রথম যার গার্হস্থ্য কৃষিকাজে ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রাচীন গ্রীসে খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০০ বছর আগে। এর আদি উৎস ধরা হয় পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া।

অপর পক্ষে মুগ ডালের ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য কৃষির সূত্রপাত হয় ইরানে। ভারতীয় উপমহাদেশের বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনস্থলেই (যেমন হরপ্পা সভ্যতার পূর্বভাগে, পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম ভারতের ৪৫০০ বছর আগে। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটকে ৪০০০ বছর আগে) মুগডাল ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ৩৫০০ বছর আগে ভারতের প্রায় সর্বত্র মুগ ডাল চাষ হত। ভারত থেকেই তা চীন ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যত্র বিস্তার লাভ করে।

অড়হর ডালের ব্যবহারের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় আজ থেকে ৩৫০০-৩৪০০ বছর আগে বর্তমান কর্ণাটক-মহারাষ্ট্র-ওড়িশা-কেরল ইত্যাদি অঞ্চলে। এই ডাল ভারত থেকে পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় পৌঁছেছিল। যেখান থেকে ইউরোপ এবং পরবর্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্রীতদাস ব্যবসার সূত্র ধরে আমেরিকায় পৌঁছায়।

এ পর্যন্ত পাঠ করে বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক বাতাবরণে কোন কোন পাঠকের মনে হতেই পারে যে এই নিবন্ধের উদ্দেশ্যই হল ‘ভারতে কিছুই ছিলনা’ এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ক্রান্তীয় জৈববৈচিত্রে সমৃদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশও বহু ফল শস্য আর সব্জির উৎসভূমি। তাই কাজুবাদাম আর পেয়ারার উৎস ব্রাজিল (পর্তুগীজরা এনেছিল), আতার উৎস ক্যারীবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, আনারস (কলম্বাস ইউরোপে নিয়ে এসেছিলেন) বিদেশী আর তরমুজ (উৎস আফ্রিকার

কালাহারি অঞ্চল। ৫০০০ বছর আগে মিশরে চাষ হত। ভূমধ্যসাগর হয়ে মধ্যএশিয়া, দশম শতাব্দীতে চীন। ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপ আর আফ্রিকার ক্রীতদাসদের হাত দিয়ে উত্তর আমেরিকায় বিস্তার) মোঘলদের দ্বারা ভারতীয় ভূখন্ডে নিয়ে আসা হয়ে থাকলেও প্রাচীনযুগ থেকে এদেশে জন্মানো, ও ব্যবহৃত শস্য-শাক-সবজি ফল এর তালিকাও বিরাট।

সেই তালিকার দিকে চোখ বোলানোর আগে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারত বলতে বর্তমান রাজনৈতিক ভারত রাষ্ট্র নয়। বরং ভারতীয় উপমহাদেশ। উদ্ভিজ প্রভৃতির কথা যখন আসে তখন ঠিক ভাবে বললে দাঁড়ায় ক্রান্তীয় জলবায়ু প্রধান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া। কারণ বিজ্ঞানের বিকাশ আদি উৎসের আত্মগর্ব (যদি কিছু থাকে) আর আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা মুছে দেবার আগে আঞ্চলিক জলবায়ুই ছিল উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য নির্ণায়ক।

বেগুন (প্রায় ৭০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে), হলুদ, গোলমরীচ, সরষে, এলাচ প্রায় ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে এই অঞ্চলে উৎপাদিত হত। ধান (চীনও এর উৎসভূমি), আম (৪০০০ বছরেরও আগে উৎপাদিত হত), কলা (পাপুয়া নিউগিনি ও ভারতসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে আফ্রিকা-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ হয়ে উত্তর আমেরিকা), নারকেল (এর বিভিন্ন রকমফের দুনিয়া জুড়েই উপকূলীয় অঞ্চলে পাওয়া যেত), আখ, ডুমুর, কাঁঠাল (পশ্চিমঘাট পর্বতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ৩০০০-৬০০০ বছর আগে আওয়া গেছে), সজনে (হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে ৫০০০ বছর পূর্বে), জিরে, হলুদ, নীম, দারচিনি (শ্রীলঙ্কা), বেল, পাতিলেবু (ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া এর উৎস), চিচিঙ্গা, কুদরি, অড়হর ডাল, জাম (ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন ও অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে এর বিভিন্ন প্রকার এর উৎস নির্ণীত হয়েছে), কালো কলাই, করলা (বর্তমান কেরালা রাজ্য সন্নিহিত অঞ্চলে উৎসভূমি) আমলকী ইত্যাদি বহু ফল-সব্জি-মশলার আদি বা অন্যতম আদি উৎসভূমি হল ভারতীয় উপমহাদেশ।

বর্তমানে উন্নত বিজ্ঞানের (জিন ও ডি. এন. এ পরীক্ষা) সাহায্য নিয়ে উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির আদি উৎসগুলোকে আরো নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। তাই অতীতের অনেক ধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া আগামী দিনেও চলবে।

দ্বিতীয়তঃ বন্য উদ্ভিজ্জ প্রকৃতিকে গার্হস্থ্য কৃষিতে অন্তর্গত করার প্রক্রিয়াটা ছিল ধারাবাহিক। মানুষ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ব্যবহার করে লাগাতার সংকর জাতের জন্ম দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান তাকে বহুগুণ বিকশিত করেছে।

তৃতীয়তঃ এই রচনায় ব্যবহৃত তথ্যাদি যতদূর সম্ভব নির্ভরযোগ্য করার প্রয়াস রাখা হয়েছে। যাদের উৎস সম্পর্কে দ্বিমত বা বিতর্ক আছে ইচ্ছে করেই সেগুলো বাদ রাখা হয়েছে। উৎপাদনের তথ্য নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (FAO) এর প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে।

সুতরাং যা সাধ্যের মধ্যে যা রুচি সম্মত তাকেই খাদ্যরূপে গ্রহণ করুন। কোন কট্টর বিচারধারা অনুযায়ী খাদ্যের বাছবিচার বিভ্রম ছাড়া অন্য কিছুই সৃষ্টি করবে না। আজকের অভ্যাস কাল বদলাবেই।

পরিশেষে ভবিষ্যৎ রচনার জন্য আমরা স্মরণ করি সেই অনাকাঙ্খিত সত্যকে যে রুচিসম্মত তো দূর, দুনিয়ার বিরাট শতাংশ মানুষ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্যটুকু পায় না। বিজ্ঞানের এই মৌলিক লক্ষ্যপূরণ অবশ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞানের হাতে নেই, আছে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানের হাতে।■

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র
সমীক্ষণ ও *INSIGHT*
পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র ঃ

প্রিয় সম্পাদক,

হাতেগোনা কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকার মধ্যে আমার পছন্দের তালিকায় "সমীক্ষণ" অন্যতম। বিগত কয়েক সংখ্যা থেকে দেখছি "সমীক্ষণ" গণবিজ্ঞান ধর্মী লেখা থেকে "এলিট" ধর্মী লেখার দিকে ঝুঁকছে। বিগত দুটি সংখ্যা আগষ্ট এবং ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। পত্রিকা পাওয়া মাত্রই যথাশীঘ্র পড়া শুরু করা, ন্যূনতম পক্ষে উল্টেপাল্টে দেখা – এই অভ্যাস উবে গেল দুটি সংখ্যার প্রচ্ছদ দেখেই। বিশাল শিরোনাম ও ছবি – সূর্যকে ছুঁতে রওনা হল নাসার মহাকাশ যান, পার্কার সোলার প্রোব (অগাস্ট) এবং ডিসেম্বরে "চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণ" আবিষ্কারের গল্প ঃ উড়োজাহাজ, ক্লোন পদ্ধতি ইত্যাদি।

এগুলি জানার অবশ্যই দরকার আছে তবে প্রাথমিকতা নয়। আমার মত সাধারণ মানের পাঠক, যাদের জন্যই সমীক্ষণের আত্মপ্রকাশ, তাদের কাছে 'পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি'র মত। তাই এগুলি প্রচ্ছদরূপে কাম্য নয়। অনেকেই জানি সূর্য ছোঁয়া, চাঁদে যাওয়া, যুদ্ধাস্ত্র তৈরির মহড়া, সাধারণ মানুষের ভোর থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিদিনে বাঁচার লড়াই জানা বোঝার ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসবেনা। বিপরীতে বুর্জোয়া বিজ্ঞানের ফসলগুলো নিয়ে গর্ববোধ করতে শিখবে।

তাই আবেদন এলিট ধর্মী লেখা একটি দুটি থাক কিন্তু পত্রিকার বেশির ভাগ পৃষ্ঠা ভরা থাকুক সাধারণের ব্যবহার উপযোগী বিজ্ঞানে। প্রচ্ছদ হউক সাধারণের। যাতে "মুখ (প্রচ্ছদ) দেখেই মুখ না ফেরাতে হয়"। জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা বিষয়ক লেখা থাকুক না দু একটি।

অনেক শুভেচ্ছা ও প্রত্যাশায়
সত্যেন্দ্র পাল, ত্রিপুরা

সম্পাদকের জবাব ঃ

পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি অভিযোগ করেছেন সমীক্ষণ "গণবিজ্ঞান ধর্মী" লেখা থেকে বিগত কয়েক সংখ্যায় "এলিট ধর্মী" লেখার দিকে ঝুঁকছে। প্রথমেই বলি এই অভিযোগ আক্ষরিক অর্থে না হলেও আপনি মুখ্যত যা বলতে চেয়েছেন সেই অর্থে ভিত্তিহীন এমন দাবী আমরা করি না।

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ তার কর্মসূচীতে লিখেছে, "জনসাধারণের মধ্যে টিঁকে থাকা অলৌকিকবাদ, ঈশ্বরবাদ, অবতারবাদ, ভাগ্যবাদ এবং তজ্জনিত কুসংস্কারগুলির ইতিমধ্যে উদ্‌ঘাটিত স্বরূপগুলিকে বস্তুবাদী দর্শন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা ব্যাখ্যা করে তাঁদের বিজ্ঞান সচেতন করা। সাধারণের বৈষয়িক জীবনে প্রযোজ্য বিজ্ঞানের অবদানগুলিকে মুষ্টিমেয়র কুক্ষিগত না রেখে সর্বসাধারণের সেবায় নিয়োজনের বাধাগুলি অপসারিত করার জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। জনসাধারণকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলার জন্য বৈষয়িক জীবনের সমস্ত কিছুকে বস্তুবাদী দর্শন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা বিচার করার প্রেরণা দেওয়া।"

সমীক্ষণ এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হওয়ার ঘোষণা দিলেও এখনও সেই উদ্দেশ্যপূরণ থেকে বহু যোজন দূরে। ব্যাপক শ্রমজীবী জনতার মধ্যে লাগাতার ও নিরলসভাবে পড়ে থেকে জনতার মধ্যে টিঁকে থাকা ভাববাদী দর্শনের স্বরূপগুলি বস্তুবাদী দর্শন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার অনুশীলন সংগঠন যেদিন ব্যাপক আকারে চালাতে সক্ষম হবে সেদিনই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে, সমীক্ষণের পাতাতেও তার ছাপ ফুঠে উঠবে। এই কাজে সংগঠনের সাফল্য নগণ্য হওয়ায় সমীক্ষণেও তার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

তবে এই প্রসঙ্গে আপনার তথা সাধারণভাবে পাঠকসমাজের ধারণার অস্বচ্ছতা কাটাতে বলা দরকার যে গণবিজ্ঞান আন্দোলন এবং গণআন্দোলন সম্পূর্ণ এক নয়। গণবিজ্ঞান আন্দোলন বলতে সমাজের ব্যাপক জনতাকে বস্তুবাদী দর্শন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে বিজ্ঞান সচেতন করা। আর গণআন্দোলন হল বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় শাসকশ্রেণী দ্বারা শোষণ নিপীড়ণের বিরুদ্ধে ব্যাপক শোষিত নিপীড়িত জনতার দাবী এবং অধিকার আদায়ের আন্দোলন। বস্তুবাদী দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা বিজ্ঞান সচেতন জনতা বিজ্ঞানের অবদানগুলি সর্বসাধারণের সেবায় নিয়োজনের বাধাগুলি অপসারণের আন্দোলন এর প্রয়োজনীয়তা সচেতনভাবে উপলব্ধি করে। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কাজ জনসাধারণের মধ্যে এর প্রয়োজনীয়তা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। তবে বই পড়ে, বৈঠকী আলোচনায় এই চেতনার যথার্থ বিকাশ হয় না। গণআন্দোলনে সামিল হলেই এই চেতনা বিকাশের সম্ভাব্য সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ প্রথমোক্ত কাজে আত্ম-নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং গণআন্দোলন বিকাশের জন্য কর্মরত শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব সংগঠনের কাজে সহযোগিতার এবং তাদের আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আপনার সাথে আমরাও একমত যে এই সমাজের বহু মানুষের কাছে পূর্ণিমার চাঁদ আজও ঝলসানো রুটিরই মত। কিন্তু তাদের বিজ্ঞান সচেতন করার প্রয়োজন নেই এমন ভাবনা ভুল। সেইসব নিরন্ন মানুষগুলোকে বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে

বিজ্ঞান সচেতন করার কঠিন দায়িত্ব আমাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। বৈষয়িক জীবনের, দৈনন্দিন জীবনের অনুশীলন থেকে আমাদের সেটা নিরলসভাবে করা প্রয়োজন। তবে আপনার অভিমত "সূর্য ছোঁয়া, চাঁদে যাওয়া, যুদ্ধাস্ত্র তৈরির মহড়া, সাধারণ মানুষের ভোর থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিদিনের বাঁচার লড়াই জানা বোঝার ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসবে না" – এমন ভাবনা কতটা বিজ্ঞান সম্মত তা ভেবে দেখবেন। এখনও অধিকাংশ মানুষের ধারণা আমাদের মাথার উপরের গ্রহ নক্ষত্রে দেবতাদের বাস, স্বর্গ-মর্ত্য সেখানেই। সুতরাং সেইসব গ্রহ-নক্ষত্রে মানুষের পর্দাপণ এর কাহিনী তাদের মধ্যকার ভাববাদী দর্শনকে অবশ্যই আঘাত করে। আপনি লিখেছেন "বিপরীতে বুর্জোয়া বিজ্ঞানের ফসলগুলো নিয়ে গর্ববোধ করতে শিখবে" "বুর্জোয়া বিজ্ঞান" (এবং তার বিপরীতে সর্বহারার বিজ্ঞান) বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন? বিজ্ঞান শ্রেণীনিরপেক্ষ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাসীন শাসকশ্রেণী (বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বুর্জোয়াশ্রেণী) বিজ্ঞানের সুফলগুলি আত্মসাৎ করে এবং নিজশ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করে। বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে "বুর্জোয়া বিজ্ঞান" আখ্যায়িত না করে আমাদের কাজ বিজ্ঞানের সকল অবদানগুলিকে বুর্জোয়াশ্রেণী যেভাবে নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখেছে, সর্বসাধারণের সেবায় তার নিয়োজনের বাধাগুলি অপসারিত করার জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা আমাদের কাজ। সুতরাং আপনার এই দৃষ্টিকোণের সাথে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ সহমত নয়।

সবশেষে বলি, আগামী সংখ্যা থেকে আপনার পরামর্শমত সাধারণের ব্যবহার উপযোগী বিজ্ঞানের চর্চার দিকে এবং জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, জনবিজ্ঞান নিয়ে অধিক রচনা প্রকাশের প্রয়াস রাখব।■

মহাশয়,

আমি আপনাদের প্রকাশিত সমীক্ষণ পড়েছি। আমার এই বইটি খুব ভালো লেগেছে। বিজ্ঞানের অনেক উন্নতির গল্প পড়তে পেয়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার মহাকাশ সম্পর্কে অনেক কিছু অজানা ছিল। এই পত্রিকা পড়ে সে সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করেছি। আরও বেশি আনন্দিত হয়েছি এটা শুনে যে সূর্যের সবথেকে কাছে পার্কার সোলার প্রোব পাঠানো হয়েছে। সূর্য সম্পর্কে আমার আরও জানার আগ্রহ আছে। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর জীবনীটা আমার খুব ভাল লেগেছে। যদিও তাঁর জীবন সম্পর্কে খুব অল্প তথ্য দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং আপনি যদি আরও বেশি করে মহাকাশ ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য প্রকাশিত করেন তাহলে ভাল হত।

মিতালি মন্ডল
বনগ্রাম, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাপিঠ

মহাশয়,

আমি সমীক্ষণ পড়েছি। এই বইটি থেকে মহাকাশ সম্পর্কে অনেক অজানা জিনিস জানতে পেরেছি। এখান থেকে আমি কেরালার বন্যা সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যও জানতে পেরেছি। 'ঐতিহাসিক বিজ্ঞান ও পুরাণ কাহিনী' আমার ভাল লেগেছে। আমার সব থেকে আগ্রহের বিষয় হল "সূর্যকে ছুঁতে রওনা হল নাসার মহাকাশ যান" এবং "বিজ্ঞানের খবর"। আমি আর যে জিনিসগুলি জানতে চাই তাহল সমস্ত কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখার কারণ, চাঁদের মাটিতে জল পাওয়ার বিষয়, বিজ্ঞানী হকিং-এর মত আরও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের জীবনী, পার্কার সোলার প্রোবের সমস্ত গতিপথ।

মিতালি বিশ্বাস
বনগ্রাম, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাপিঠ

সম্পাদকের উত্তর ঃ

প্রিয় পাঠক বৃন্দ, জ্ঞান অর্জনের প্রথম পরোক্ষ উপায়টি হল অধ্যয়ন। মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানবজাতির জ্ঞান ক্রম বিকাশমান এবং ব্যক্তি মানুষের জ্ঞান সীমিত। শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচীতে ইতিহাস চর্চায় সমাজবিজ্ঞানের অনুপস্থিতি, বিজ্ঞান চর্চায় বিজ্ঞানের ইতিহাসের অনুপস্থিতি, প্রতিটি ক্ষেত্রে বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতিই আমাদের বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে ওঠার পথে অন্তরায়। আমাদের পত্রিকা মানবজাতির অর্জিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারে একটি আনুবিক্ষণিক প্রচেষ্টা মাত্র। এই পত্রিকা বিজ্ঞান বিকাশে এবং সমগ্র মানবজাতির বিজ্ঞানের কুফলগুলি অর্জনের পথে সামাজিক বাধাগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক ছাত্র যুবদের জাগ্রত ও সামিল করতে চায়। সমীক্ষণের এই আহ্বানে তোমাদের প্রেরিত পত্র আমাদের দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার দাবি রাখে। কিন্তু পত্রিকার গত সংখ্যায় তোমাদের পত্রের যে প্রতিফলন প্রকাশিত হয়েছিল তা সম্পাদকের দায়িত্বহীনতার পরিচয় ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ক্ষমা প্রার্থী সম্পাদক তোমাদের প্রস্তাবগুলিকে বিবেচনা করে পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় রচনা প্রকাশ করার প্রচেষ্টা রাখছে এবং রাখবে।

মিতালিদ্বয় সমীক্ষণ-এরও মিতালি। পত্রিকার পক্ষ থেকে তোমাদের নিজেদের বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে ওঠা এবং অন্যকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলার বিষয়ে তোমাদের সক্রিয় ভূমিকা কামনা করি। একটি বিশাল কর্মকান্ডে সমীক্ষণ একটি সহায়ক মাত্র।

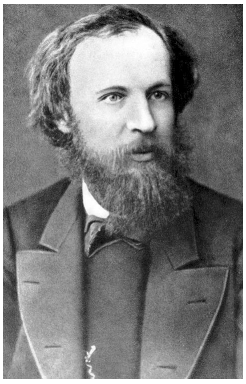

দিমিত্রি মেন্ডেলেভ

জীবনী ও আবিস্কারের কাহিনী ঃ

দিমিত্রি মেন্ডেলেভ ও পর্যায় সারণী

রসায়ন শাস্ত্রকে দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে যে সমস্ত বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব রয়েছে তাদের মধ্যে রাশিয়ান বিজ্ঞানী দিমিত্রি ইভানোভিচ মেন্ডেলেভের অবদান নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। বংশগতি তথা জেনেটিক্স-এর জগতে গ্রেগর যোহান মেন্ডেলের নাম বা বিবর্তনবাদের জগতে চার্লস ডারউইনের নাম যে অর্থে উচ্চারিত হয়, রসায়নের জগতে মেন্ডেলেভের নামও একই অর্থে উচ্চারিত হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানের এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না যেখানে তাঁর চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। একদিকে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে মৌলিক গবেষণা, অন্যদিকে, উদ্ভিদবিদ্যা, খনিবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, শিল্পে রসায়নের প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়েও ছিল তাঁর সাবলীল আনাগোনা। সর্বোপরি, সমসাময়িক সমাজ ও বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ ও শাণিত। যথার্থ কারণেই রাশিয়ান পদার্থ বিজ্ঞানী ভভিলভ বলেছিলেন মেন্ডেলেভ হলেন 'পদার্থ বিজ্ঞানে রসায়নবিদ এবং রসায়ন বিজ্ঞানে পদার্থবিদ' (physicist in chemistry and chemist in physics)। প্রকৃতিতে লুকিয়ে থাকা নিয়মগুলিকে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ করে তাকে বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার সাধনায় তিনি একদিকে যেমন ছিলেন আত্মমগ্ন, পাশাপাশি বাস্তব জীবনে তিনি ছিলেন একজন সত্যকারের শিক্ষক, একজন নির্ভীক, প্রতিবাদী মানুষ – সমাজ সচেতনতার মূর্ত প্রতীক। শুভ্রকেশ বিজ্ঞানতাপস মেন্ডেলেভ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসঘরে প্রবেশ করতেন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেমে আসত এক সশ্রদ্ধ নৈঃশব্দ্য। পরক্ষণেই তার সহজাত সম্মোহনী ক্ষমতার সাহায্যে ছাত্রদের নিয়ে চলে যেতেন রসায়নের সাম্রাজ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদে আসীন থাকাকালীন, ছাত্রদের দাবী-দাওয়া নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে দরবার করেছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রক দাবী-দাওয়া মেটাতে অস্বীকার করায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ থেকে ইস্তফা দিতে কসুর করেননি তিনি। অনেক বিজ্ঞানীর মতো 'এটা আমার বিষয় নয়'- এই মতের ঘোর বিরোধী ছিলেন দিমিত্রি মেন্ডেলেভ। আর এই কারণেই, তৎকালীন রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের তুলনায় বহু যোজন এগিয়ে ছিল তাঁর চিন্তা-চেতনা। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক আবিষ্কার পর্যায়সারণীর অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানটি প্রাথমিকভাবে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি অনেকেই। ঐ পরিস্থিতিতে মেন্ডেলেভ একদিকে যেমন ছিলেন স্থিতধী অন্যদিকে ছিলেন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে অবিচল। একজন প্রকৃত শিক্ষকের যা করা উচিত ছিল তিনি তাই করেছিলেন। ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আবিস্কারের গুরুত্বকে সকলের কাছে হাজির করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বোঝাতে পেরেছিলেন বিজ্ঞান একটি গতিময় প্রক্রিয়া আজকের আবিষ্কার বা গবেষণা হল আগামীর সম্ভাবনা। তাই তো পরবর্তী সমাজ প্রত্যক্ষ করল, পর্যায় সারণী নামক যে বীজ মেন্ডেলেভ বপণ করেছিলেন বর্তমানে তা মহীরুহ আকার ধারণ করেছে। রসায়নের শাখা-প্রশাখাকে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিস্তৃত করতে পর্যায় সারণী পালন করেছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আজ থেকে ঠিক দেড়'শ বছর আগে ১৮৬৯ সালে রসায়ন তথা বিজ্ঞানের জগতে ঘটেছিল সেই যুগান্তকারী ঘটনা। কি এই পর্যায় সারণী? কিভাবে মেন্ডেলেভ আবিস্কার করলেন পর্যায় সারণী? এ সব জানার আগে মেন্ডেলেভের জীবনপঞ্জিকায় একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

মেন্ডেলেভের পিতামহ পাভেল সকোলভ ছিলেন রাশিয়ার এক ছোট্ট গ্রামের এক গীর্জার পুরোহিত। তাঁর চার সন্তানের অন্যতম ছিলেন ইভান পাভলোভিচ মেন্ডেলেভ (১৭৮৩-১৮৪৭)। ইভানের সপ্তদশ ও কনিষ্ঠতম সন্তান হলেন দিমিত্রি ইভানভিচ মেন্ডেলেভ। ইভানের সতেরজন সন্তান সন্ততির মধ্যে চোদ্দজন ছিল জীবিত, বাকী তিন জনের মৃত্যু হয় শৈশবেই। ইভান সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে পড়াশুনা করেন ও সেখানকার একটি কলেজ থেকে স্নাতক হন। তারপর, দেশের বিভিন্ন শহরে শিক্ষকতা করেন ও শেষমেষ ১৮২০ সালে সাইবেরিয়ার টবলস্ক শহরের জিমনাসিয়াম স্কুলের অধিকর্তা নিযুক্ত হন। ইভানের স্ত্রী অর্থাৎ দিমিত্রির মা ছিলেন মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা। মারিয়ার পিতামহ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, রাশিয়ার প্রথম কাঁচ কারখানার মালিক। মারিয়ার বাবা জীবনে তেমন সাফল্য পাননি। মারিয়া ছিলেন বুদ্ধিমতী ও সন্তান সন্ততিদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ও স্নেহপরায়ণ।

মেন্ডেলেভ পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক হলেও তাঁরা সুখেই বসবাস করছিলেন। বাড়িতে টবলস্ক শহরের নামকরা বুদ্ধিজীবীদের যাতায়াত ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে সেন্ট পিটার্সবার্গ-এ জার বিরোধী বিদ্রোহে অভিযুক্ত হয়ে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিলেন এমন ব্যক্তিদেরও যাতায়াত ছিল মেন্ডেলেভ পরিবারে। অর্থাৎ, বাড়ীতে অবাধ মুক্ত চিন্তার পরিবেশ বিরাজ করত। বাড়ীতে ছিল পুস্তক বোঝাই এক মস্ত লাইব্রেরী। তার টানেও আসতেন

শহরের বহু বুদ্ধিজীবী। বাড়ীতে ছিল পড়াশুনার এক সুন্দর বাতাবরণ। এমন পরিবেশেই ১৮৩৪ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেন্ডেলেভ। কিন্তু হায়, ঐ বছরেই ইভান দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বসেন। ফলে, কলেজের অধিকর্তার চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় তাঁকে। পেনশনের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তার পরিমাণ এতই অপ্রতুল যে মারিয়ার পক্ষে সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। অগত্যা রোজগারের অন্য উপায় দেখতে হল মারিয়াকে। অবশেষে, তার ভাইয়ের কাঁচ কারখানার কাজকর্ম দেখভাল করার কাজের বিনিময়ে কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করা গেল। কিছুদিন এভাবে চলার পর একদিন কারখানায় আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তার সাথে ভস্ম হয়ে গেল মেন্ডেলেভ পরিবারের স্বপ্ন। এর কিছুদিনের মধ্যেই ইভানের মৃত্যু হয় (১৮৪৭)। দিমিত্রি তখন ১৩ বছরের বালক।

১৮৪১ সালে ৭ বছর বয়স থেকেই দিমিত্রির স্কুল শিক্ষা শুরু হয় স্কুলের নিয়মের এক বছর আগেই। এই কারণে প্রথম শ্রেণীতে দুই বছর পড়াশোনা করতে হয় তাকে। স্কুলের অন্তিম পরীক্ষায় পাশ করার ন্যূনতম বয়স ১৬ হলেও দিমিত্রির বয়স তখন ছিল ১৫। স্কুল কলেজের নিয়মের জটিলতা এড়ানোর জন্য সার্টিফিকেটে বয়স লেখা হল ১৬। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও গণিতে দিমিত্রি ছিল মোটামুটি ভাল কিন্তু সাহিত্যে ছিল দুর্বল। মস্কো শহরে ছিলেন মারিয়ার এক ধনকুবের ভাই ভ্যাসিলি। মারিয়া ঠিক করলেন ছেলেকে মামার কাছে রেখে উচ্চশিক্ষার জন্য মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাবেন। তাই ১৮৪৯ সালে এক মেয়ে লিজা ও দিমিত্রিকে সঙ্গে নিয়ে টবলস্ক থেকে মস্কোর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন মারিয়া। অতিক্রম করতে হবে প্রায় ৩৫০০ কিমি পথ, কখনো ঘোড়ায় টানা স্লেজে কখনো পায়ে হেঁটে অবশেষে ওরা তিনজনে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু নিরাশ হতে হল ওদের। কারণ, তখনকার রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী স্কুলের গণ্ডি পার করে যে কোন ছাত্রকে নিকটবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াই ছিল রীতি। দিমিত্রির ভর্তির আবেদন বাতিল হল। অগত্যা মারিয়া সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেকে নিয়ে এলেন যদি সেখানে আবেদন গ্রাহ্য হয়। সেইসময় রাশিয়ার রাজধানী ছিল পিটার্সবার্গ। কিন্তু, একই কারণে হতাশ হতে হল মেন্ডেলেভদের। অবশেষে, ১৮৫০ সালে দিমিত্রির বাবার এক বন্ধুর বদান্যতায় পিটার্সবার্গেরই এক কলেজে পড়াশুনা করার ব্যবস্থা হল দিমিত্রির। রসায়নের প্রতি অনুরাগ ছিল বরাবরই। ভর্তির পরীক্ষায় পাশ করে স্কলারশিপের ব্যবস্থা হল। হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হল। মেন্ডেলেভ পরিবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু সেই স্বস্তি বেশীদিন স্থায়ী হল না। ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বরে মা'কে হারালেন দিমিত্রি। এরপর ১৮৫১ সালে মামা ভ্যাসিলি ও পরের বছরের অর্থাৎ ১৮৫২ সালে বোন লিজা মারা গেলেন। দিমিত্রি নিজেও মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কয়েক মাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। ডাক্তার বললেন যক্ষ্মা, যার থেকে কখনই পুরোপুরি সেরে ওঠা সম্ভব নয়। পড়াশুনায় এক বছর নষ্ট হল। কিছুদিন পর দিমিত্রি আপাত সুস্থ হয়ে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করলেন কিন্তু বিগত কয়েক বছরে তার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় সামলাতে তার বেশ কিছুদিন সময় লেগে গেল। কলেজের প্রথম পরীক্ষায় কোন রকমে পাশ করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বদলে ফেললেন দিমিত্রি। সামাজিক ও শারীরিক সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করলেন কঠিন অধ্যাবসায় ও নিয়মানুবর্তিতায়। দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষায় প্রথম সাত জনের মধ্যে এসে গেলেন দিমিত্রি। দিমিত্রির গবেষণা পত্রের বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত, বৈচিত্রপূণ্য ও সামাজিক সমস্যা সম্বলিত। এই সময়েই রাশিয়ার রসায়নের পিতামহ প্রফেসর ভস্ক্রিসেনস্কি-র সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান তিনি। অবশেষে, ১৮৫৫ সালে স্বর্ণপদক পেয়ে স্নাতক হলেন। ইন্টারভিউ কমিটির অধ্যাপকেরা দিমিত্রির বিজ্ঞানের প্রজ্ঞায় অভিভূত হলেন ও স্কুল কর্তৃপক্ষ ম্যাজিস্টার ডিগ্রীর জন্য তাঁকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই থেকে যাবার আর্জি জানালেন। কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে তিনি দক্ষিণের কোন প্রদেশে যেতে চাইলেও শিক্ষা মন্ত্রক তাঁকে ছোট শহর সিম্বারপল-এ পাঠিয়ে দেয় যে জায়গাটি তাঁর গবেষণার জন্য মোটেই অনুকূল ছিল না। সেখানকার একজন চিকিৎসক মেন্ডেলেভকে পরীক্ষা করে যক্ষ্মার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নাকচ করে দেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মেন্ডেলেভ। এদিকে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পুরো শহরটা মিলিটারী ক্যাম্পে পরিণত হয়ে গেছিল। বাধ্য হয়ে ওপর তলায় যোগাযোগ করে প্রথমে ওডেসায় ও পরে আবার সেন্ট পিটার্সবার্গে ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে ফিরে এলেন। কলেজে প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও গণিতে শিক্ষকতার পাশাপাশি থিসিস লেখার কাজ চলতে থাকল পুরোদমে। প্রথমে কেলাস পদার্থের সমাংশতা, বিভিন্ন তরলের আপেক্ষিক আয়তন (আণবিক গুরুত্ব/ঘনত্ব) ও পরে সিলিকার যৌগের উপর গবেষণা তাঁকে ম্যাজিস্টার ডিগ্রী অর্জনে সহায়তা করে। ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য পারিশ্রমিকে প্রাইভেট শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা লিখতেন। ১৮৫৮ সালের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাশিয়ার বিজ্ঞানে অগ্রগতি ঘটানোর জন্য দিমিত্রিকে ২২ মাসের ফেলোশিপে ইউরোপে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত দিমিত্রির বৈজ্ঞানিক জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা সংযোজিত করে।

১৮৫৯ সাল, ইউরোপে তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়জয়কার। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালী, জার্মানীর প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের হাত ধরে বিজ্ঞান তখন কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করতে চলেছে।

কি মৌলিক গবেষণায়, কি প্রযুক্তিতে, সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের পীঠস্থান হল ইউরোপ। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার গুলিতে বুনসেন, বার্থেলো, উর্জ, ডুমা, আর্লেনমেয়ার, জিনিন, লিবিগ ইত্যাদি বিজ্ঞান সাধকদের ভিড়। তাঁদের সাথে মিলিত হলেন আর এক বিজ্ঞানপ্রতিভা দিমিত্রি মেন্ডেলেভ। ইউরোপের বিভিন্ন শহর ঘুরে অবশেষে জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ শুরু করলেন। ইউরোপে কর্মরত অবস্থায় মেন্ডেলেভ সেইসময়কার বিজ্ঞানের সর্বাধিক অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হলেন ও সমাজের প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করেন। কাজের সুবিধার জন্য একটা আস্ত ল্যাবটেরী বানিয়ে ফেলেছিলেন নিজের বাসস্থানে। যন্ত্রপাতির অভাব দেখলে নিজেই বানিয়ে ফেলতেন নতুন কিছু। আপেক্ষিক আয়তন পরিমাপের জন্য বানিয়ে ফেলেছিলেন একটা যন্ত্র যা মেন্ডেলেভের পিকনোমিটার নামে খ্যাত। গ্যাসের সংকট তাপমাত্রার ধারণা মেন্ডেলেভেরই আবিস্কার। জৈব রসায়নের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল বরাবরই। বিভিন্ন জৈব যৌগের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিস্তর তথ্য তৈরী করেন। ১৮৬০ সালে প্রথম রসায়ন কংগ্রেসে যোগদান ক'রে বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীদের গবেষণার কথা জানতে পারেন। ঐ কংগ্রেসেই মৌলের পারমাণবিক ভর, তুল্যাংক ভর যৌগের আণবিক ভর ইত্যাদির সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণে দিমিত্রি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ঐ কংগ্রেসে বিজ্ঞানী ক্যান্নিজ্যারোর বক্তব্যে ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর শিক্ষাগুরু ভস্ক্রিসেনস্কি-র সাথে যৌথভাবে রাশিয়াতেও অনুরূপ উদ্যোগ নেবার পরিকল্পনা করেন। এদিকে দেখতে দেখতে ইউরোপে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। মেন্ডেলেভ রাশিয়ান সরকারের কাছে মেয়াদকাল বৃদ্ধি করার আবেদন করলে তা নাকচ হয়।

অগত্যা, ১৮৬১ সালে মেন্ডেলেভ ফিরে এলেন সেন্ট পিটার্সবার্গে। রাশিয়ায় তখন চলছে রাজনৈতিক উথালপাথাল। এসে দেখলেন পুরানো প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়ে তার জায়গায় তৈরী হয়েছে একটি মিলিটারী হাসপাতাল। চলে গেছে তার চাকরীটাও, যা ছিল তার রোজগারের একমাত্র উপায়। এদিকে বাজারে অজস্র দেনা ও সামাজিক দায় দায়িত্ব। বাধ্য হয়ে একসাথে বেশ কয়েকটা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিলেন। কোথাও রসায়ন, কোথাও পদার্থ বিজ্ঞান, এমনকি কোথাও ভূগোল পড়াতে শুরু করলেন, বাদ গেলনা কোন বিষয়। পাশাপাশি লিখতে শুরু করলেন একটি বই 'জৈব রসায়নের হ্যান্ডবুক'। সেই সময় রাশিয়ায় সেরা বিজ্ঞান রচনার জন্য মোটা টাকা পুরস্কৃত করা হত যা ছিল খুবই জনপ্রিয় ও সম্মানজক। ডেমিডভ পুরস্কার ছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম। মেন্ডেলেভ মনস্থ করলেন ঐ বইটি তিনি ডেমিডভ কমিটির কাছে পাঠাবেন। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। ৫০০ পৃষ্ঠার বই মাত্র সাড়ে তিন মাসের মধ্যে লেখা শেষ হল। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হল। ঐ সময়ে সেই বইটি ছিল জৈব রসায়নের একমাত্র হ্যান্ডবুক যা স্কুল কলেজের পড়ুয়াদের কাছে হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। বইটিতে হাইড্রোকার্বনের শ্রেণীবিভাগ, কার্বন হাইড্রোজেনের অনুপাত ও তার সাথে অসংপৃক্ততার সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক আধুনিক ধারণা ছিল যা মেন্ডেলেভকে ১৮৬২ সালে ডেমিডভ পুরস্কারের সম্মান এনে দিল। পুরস্কারের অর্থ দিয়ে সমস্ত ঋণ শোধ করলেন, ফিওজভা লেসচোভা কে বিবাহ করলেন, একটি নামকরা পত্রিকায় অনুবাদক-সম্পাদক হিসাবে কাজ পেলেন। অনুবাদকের কাজ করতে করতেই চার খন্ডের প্রযুক্তি-বিশ্বকোষ লিখে ফেললেন যা মেন্ডেলেভকে বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল। পি এইচ ডি ডিগ্রী ছাড়াই সেন্ট পিটার্সবার্গ প্র্যাক্টিকাল টেকনোলজিকাল ইনস্টিটিউটে প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত হলেন। জল ও ইথাইল অ্যালকোহলের বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রণে সৃষ্ট দ্রবণের ভৌত ধর্ম কি ভাবে পরবর্তন হয় তা তিনি বিশদ ভাবে পরীক্ষা করেন যা পরবর্তীকালে দ্রবণের রাসায়নিক তত্ত্বের জন্ম দেয়। এই গবেষণাটির জন্যই তিনি ১৮৬৫ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ঐ সময় অনেকে প্রচার করতেন যে বিশ্বখ্যাত পানীয় রাশিয়ান ভদকায় ইথাইল অ্যালকোহলের মাত্রা নাকি মেন্ডেলেভ স্থির করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, সরকারীভাবে তা নাকচ করা হয়।

ঐ সময়, রাশিয়াতে ষাট দশকে রসায়নবিদদের কয়েকটি সরকারী ইউনিয়ন বা সোসাইটি ছিল। যেমন রয়েল কেমিক্যাল সোসাইটি। কিন্তু, সেগুলি ছিল প্রায় নিষ্ক্রিয়। তাদের সভাগুলি ছিল অনিয়মিত। এমনকি তাদের কোন জার্নালও প্রকাশিত হত না। মেন্ডেলেভ নিজের উদ্যোগে তৈরী করেছিলেন রাশিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি যার কর্মসূচী ও কর্মনীতিও রচনা করেছিলেন নিজেই। ১৮৬৮ সালে সেই সোসাইটি সরকারী স্বীকৃতি পায় ও ১৮৬৯ সাল থেকে নিয়মিত জার্নাল প্রকাশিত হতে থাকে।

এদিকে, ১৮৬৭ সালে, প্রবাদ প্রতিম বিজ্ঞানী ভস্ক্রিসেনস্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই জায়গায় মেন্ডেলেভকে স্থলাভিসিক্ত করলেন। ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই মেন্ডেলেভ অনুভব করেছিলেন যে রাশিয়ার রসায়ন তথা বিজ্ঞান চর্চার মান ইউরোপের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। ছিল না উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক, ছিল না দক্ষ শিক্ষক, ছিল না স্কুল- কলেজের সঠিক পরিকাঠামো। জৈব রসায়ন এর প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ থাকলেও, ছাত্রদের অজৈব রসায়ন পড়ানোর দায়িত্ব নিতে হল মেন্ডেলেভকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বিভাগটি ছিল সবচেয়ে অবহেলিত ও নিম্নমানের। অজৈব রসায়ন পড়াতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন ঐ বিষয়ে ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত তেমন কোন বই নেই। তাই পাঠ্যপুস্তক

Tabelle II.

Reihen	Gruppe I. — R^2O	Gruppe II. — RO	Gruppe III. — R^2O^3	Gruppe IV. RH^4 RO^2	Gruppe V. RH^3 R^2O^5	Gruppe VI. RH^2 RO^3	Gruppe VII. RH R^2O^7	Gruppe VIII. — RO^4
1	H=1							
2	Li=7	Be=9,4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27,3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35,5	
4	K=39	Ca=40	—=44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63.
5	(Cu=63)	Zn=65	—=68	—=72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	—=100	Ru=104, Rh=104, Pd=106, Ag=108.
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	—	Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199.
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	
12	—	—	—	Th=231	—	U=240	—	— — — —

der chemischen Elemente.

মেন্ডেলেভের পর্যায় সারণী

রচনার কাজটি নিজের হাতেই তুলে নিলেন তিনি। রচিত হল 'ফাউন্ডেশন অফ কেমিস্ট্রি'। ১৮৬৮-৬৯ তে প্রথম প্রকাশিত হল প্রথম খন্ড। ১৮৭১ তে দ্বিতীয় খন্ড। মেন্ডেলেভের জীবদ্দশায় বইটির আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আরও পাঁচটি। পরবর্তীতে, রাশিয়ান ছাড়াও জার্মান, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাতেও অনুবাদিত হয় বইটি। বইটির প্রত্যেকটি সংস্করণ ছিল আগেরটির তুলনায় অধিক উৎকর্ষ।

সেই সময় আবিস্কৃত ৬৩টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে প্রথম খন্ডে মেন্ডেলেভ স্থান দিয়েছিলেন মাত্র আটটি মৌলকে। সেগুলির মধ্যে ছিল কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস ইত্যাদি। মৌলগুলির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম, পারস্পরিক রাসায়নিক আসক্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল ঐ খন্ডে। কিন্তু দ্বিতীয় খন্ডে অবশিষ্ট মৌলগুলিকে কি ভাবে উপস্থাপিত করবেন সেই বিষয়ে কোন পরিস্কার ধারণা ছিল না মেন্ডেলেভের। তাই তিনি পড়লেন গভীর সমস্যায়। গভীর চিন্তামগ্ন হলেন। তিনি চেষ্টা করলেন মৌলগুলির শ্রেণীবিভাগ করা যায় কিনা। হঠাৎই মেন্ডেলেভের মাথায় খেলে গেল এক যুগান্তকারী ধারণা। মৌলগুলির পারমাণবিক ওজনের সাথে তার রাসায়নিক ধর্মের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কিনা? সমধর্ম সম্পন্ন মৌলগুলিকে একই পরিবারের মধ্যে রেখে তাদের পারমানবিক ওজনের পার্থক্যের মধ্যে একটা ছক বা প্যাটার্ন খুঁজে পেয়ে চমকিত হয়ে গেলেন মেন্ডেলেভ। লক্ষ্য করলেন, অনুভূমিক ভাবে মৌলের পারমাণবিক ভরগুলিকে ক্রমবর্ধমানে সাজালে এক বিশেষ অন্তরে তাদের রাসায়নিক ধর্মের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এ যেন এক কবিতার ছন্দ। আপাতভাবে জড় পদার্থগুলো যেন কথা বলছে, একই সুরে গান গাইছে। সেই সুরের মূর্ছনা আর আবিস্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে রইলেন মেন্ডেলেভ। এক সপ্তাহের মধ্যেই ৬৩টি মৌলকে ঐ ছন্দ মিলিয়ে একটা সারণী বানিয়ে ফেললেন তিনি। নাম দিলেন পর্যায় সারণী।

অর্থাৎ, এমন একটি সারণী যেখানে মৌলগুলির পারমাণবিক ওজন ও রাসায়নিক ধর্ম পর্যায়ক্রমিক ভাবে একটা নিয়ম মেনে পরিবর্তিত হচ্ছে। মেন্ডেলেভের বানানো সারণীর সবকটি খোপ যে মৌল দ্বারা ভর্তি ছিল এমন নয়, অনেক খোপ ছিল ফাঁকা বা কোন কাল্পনিক মৌলের নাম। কারণ সেই সমস্ত খোপের মৌলগুলি ছিল তখনো অনাবিস্কৃত। মেন্ডেলেভ ভবিষ্যৎবাণী করলেন ঐ ফাঁকা জায়গার মৌলগুলি আবিস্কার হলে তার ধর্ম কেমন হবে বা তার পারমাণবিক ওজন কত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যালুমিনিয়াম-এর ঠিক নীচের যে মৌলটির থাকার কথা ছিল সেটি তখনো জানা ছিলনা তাই জায়গাটি একদম ফাঁকা না রেখে মৌলটির নাম দিলেন একা-অ্যালুমিনিয়াম। অর্থাৎ, অ্যালুমিনিয়ামের মতো ধর্মবিশিষ্ট কোন মৌল। তিনি বললেন এই মৌলটি এখনও অধরা, প্রকৃতিতে কোথাও লুকিয়ে আছে। যেদিন ধরা দেবে তার স্থান হবে ঐ একা-অ্যালুমিনিয়ামের জায়গায়। একইভাবে, বোরনের নীচের অজ্ঞাত মৌলটিকে একা-বোরন, সিলিকনের নীচের মৌলটিকে একা-সিলিকন ইত্যাদি। মেন্ডেলেভ তার আবিস্কারের কথা বিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে দিলেন। ১৮৬৯ সালের ৬ই মার্চ রাশিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটিতে উপস্থাপিত করলেন তাঁর তত্ত্ব। তিন শতাধিক কপি বিলি করলেন বিজ্ঞানীদের মধ্যে। কপি পাঠালেন ইউরোপিয়ান বিজ্ঞানীদেরও। প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই নব আবিস্কৃত সূত্রটি ধোঁয়াশা ছিল। তিনি বললেন, এটি একটি প্রকৃতির নিয়ম যা তিনি সূত্রায়িত করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। এর আগেও অনেক বিজ্ঞানী যথা ডেবেরেইনার (১৮২৯), ক্রেমার (১৮৫২), গ্ল্যাডস্টোন (১৮৫৩), ডুমা (১৮৫৮), নিউল্যান্ডস (১৮৬৫) মৌলগুলিকে সাজানোর প্রয়াস রেখেছিলেন কিন্তু প্রকৃতির নিয়মটিকে সূত্রায়িত করতে পারেননি বলে তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে গ্যালিয়াম নামক একটি মৌল আবিস্কার হলে দেখা গেল মৌলটির

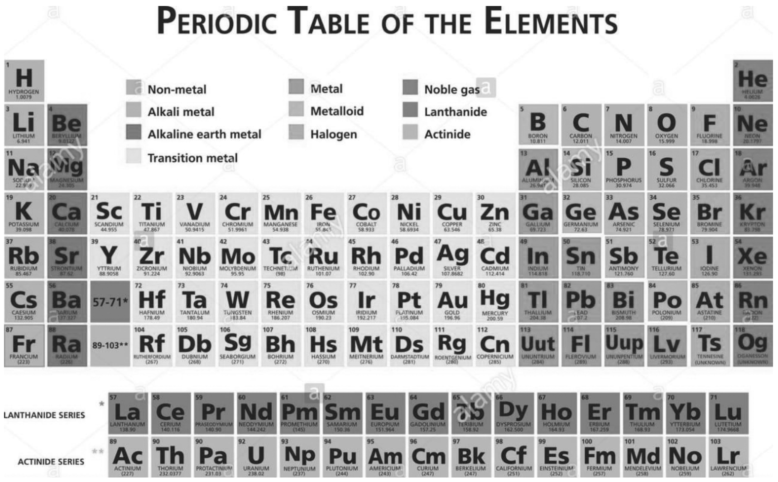

আধুনিক পর্যায় সারণী

ধর্ম, পারমাণবিক ওজন, আপেক্ষিক গুরুত্ব একা-অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে। এরপর, একে একে মেন্ডেলেভের ভবিষ্যতবাণী করা মৌলগুলি আবিস্কৃত হলে, তত্ত্বটির সঠিকতা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে সংশয় দূর হতে লাগল। এরপর আরও মৌল আবিস্কার হলে, মেন্ডেলেভ নতুন মৌলগুলিকে পর্যায় সারণীতে স্থান দিতে লাগলেন, ক্রমশঃ পর্যায় সারণির কলেবর বৃদ্ধি পেতে লাগল। কতকগুলি ক্ষেত্রে মেন্ডেলেভ লক্ষ্য করলেন পারমাণবিক ওজনের ক্রমবর্ধমান মান অনুযায়ী সাজালেও মৌলগুলির রাসায়নিক ধর্ম গ্রুপ অনুযায়ী মিলছেনা। আবার, রাসায়নিক ধর্ম অনুযায়ী সাজালে, অনেক ক্ষেত্রে পারমাণবিক ওজনের ক্রমটি লঙ্ঘিত হচ্ছে। ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে সঠিক ভাবেই তিনি রাসায়নিক ধর্মকে প্রাধান্য দিলেন। যেমন, আয়োডিনের পারমাণবিক গুরুত্ব টেলুরিয়ামের থেকে কম হলেও, মেন্ডেলেভ রাসায়নিক ধর্মকে অগ্রাধিকার দিয়ে টেলুরিয়ামকে আগে ও আয়োডিনকে পরে স্থান দিয়েছিলেন। ১৮৯৪ সালে পর্যায় সারণী কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় যখন উইলিয়াম র‍্যামসে ও লর্ড র‍্যালে আর্গন গ্যাস আবিস্কার করেন। দেখা গেল ঐ মৌলটি নিষ্ক্রিয় এবং এর পারমাণবিক ওজন ও রাসায়নিক ধর্ম পর্যায় সারণীর কোন পরিবারের কোন মৌলের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। এরপর একই ধর্ম বিশিষ্ট মৌল হিলিয়াম, নিয়ন, জেনন, ক্রিপ্টন আবিস্কার হলে, মেন্ডেলেভ পর্যায় সারণীর মূল গঠনকে অপরিবর্তিত রেখে একটি নতুন শ্রেণী বানিয়ে তাতে এই মৌলগুলিকে স্থান দিলেন। রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার জন্য এদের নাম দিলেন নিষ্ক্রিয় মৌলসমূহ। যদিও এখন এই মৌলগুলিকে আর নিষ্ক্রিয় বলা হয় না।

মেন্ডেলেভের জীবিত অবস্থায় পর্যায় সারণীর বড় ধরণের কোন সংস্কার হয়নি। পরবর্তীকালে যখন পরমাণুর বিভাজ্যতা প্রমাণিত হল, প্রমাণিত হল যে পরমাণুগুলি আসলে কতকগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত এবং সেগুলির মধ্যে প্রোটন নামক কণাটির সংখ্যাই হল একটি মৌলের নির্ণায়ক পরিচয়। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয়। ১৯১৩-১৪ সালে বিজ্ঞানী মোসলে পারমাণবিক ওজনের পরিবর্তে পারমাণবিক সংখ্যার ভিত্তিতে মৌলগুলিকে সাজানোর কথা বলেন। এর ফলে, তত্ত্বটি দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পায়। যা বর্তমানে আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণী নামে পরিচিত। এই সংস্কারের ফলে, পর্যায় সারণীর গ্রুপ সংখ্যা ৮ থেকে পরিবর্তিত হয়ে হল ১৮। কিন্তু, মেন্ডেলেভের পর্যায় সারণীর মূল গঠন অপরিবর্তিত রইল। আধুনিক পর্যায় সারণীর মোট মৌল সংখ্যা ১১৮টি, এর মধ্যে আছে বেশ কিছু কৃত্রিম মৌল। ১০১ তম মৌলটি হল 'মেন্ডেলেভিয়াম' যা নামাঙ্কিত করা হয়েছে মেন্ডেলেভের নামেই।

১৯০৫ সালের জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে তিনি তাঁর কোন এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, বিজ্ঞানে আমি চারটি অবদান রাখতে পেরেছি, সেগুলি হল – পর্যায় সারণী সূত্র, গ্যাসের স্থিতিস্থাপকতা, দ্রবণের রাসায়নিক তত্ত্ব এবং অবশ্যই আমার রচিত 'ফাউন্ডেশন অব কেমিস্ট্রি'। আর দিতে পেরেছি তিনটি পরিষেবা – গবেষণা, শিক্ষকতা ও জাতীয় শিল্পে অবদান। ১৯০৭ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় রসায়ন তথা বিজ্ঞানের জগতের অন্যতম চিন্তানায়ক দিমিত্রি মেন্ডেলেভের। তাঁর অন্তিম যাত্রায় হাজার হাজার মানুষ তথা ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রিয় শিক্ষককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁদের হাতে ছিল পর্যায় সারণীর বড় বড় কাট আউট। নোবেল কমিটিতে দু দুবার তাঁর নাম মনোনয়ন পেলেও, নোবেল কমিটির পক্ষপাতিত্বে তাঁর নাম গৃহীত হয়নি কখনই। নোবেল পুরস্কার না জিতলেও, রসায়নে দিমিত্রি ইভানভিচ মেন্ডেলেভ এবং তাঁর আবিষ্কারগুলির জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন ও থাকবেন।■

বিশেষ রচনা ঃ

ডুয়ার্সসহ অন্যান্য সমতলে
হিমালয়ের পাহাড়ী নদীগুলি কি মানুষের কার্যকলাপে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে?

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর তথা উত্তরপূর্বাঞ্চলে সুউচ্চ হিমালয় এবং দক্ষিণে তার সমান্তরালে পাদদেশ বরাবর শিবালিক পবর্তমালা বিরাজ করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শিবালিক পর্বতমালা হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টির পর তার পলিজাত (নদী এবং হ্রদে সৃষ্ট) পর্বতশ্রেণী যা বয়সে হিমালয়ের তুলনায় নবীন। এই দুই পর্বতমালা একসাথে সমান্তরালভাবে অবস্থান করায় সাধারণভাবে দুটিকে একসাথে হিমালয় পর্বতমালা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে হিমালয় পর্বতমালা সামুদ্রিক পলি দ্বারা সৃষ্ট এবং তুলনায় প্রবীন। যাই হোক, এই হিমালয় তথা শিবালিক পর্বতমালা থেকে গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, গুন্ডকসহ অসংখ্য নদী তার পাদদেশের সমতলে নেমে এসেছে অসংখ্য নদী উপত্যকা ধরে। পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চল, যা ভূটান সীমান্ত বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং জঙ্গল আকীর্ণ। ডুয়ার্স শব্দটি এসেছে ভূটানের দুয়ার বা দরজা (gateway of Bhutan) শব্দ থেকে। রাজনৈতিক মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিঙ ও কালিংপঙ জেলার সামান্য নীচু এলাকা, সমগ্র জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা এবং কোচবিহার জেলার উত্তরাংশ হল ডুয়ার্স অঞ্চল। শিলিগুড়ি রেলওয়ে জংশন থেকে কেউ যদি রেলগাড়িতে আলিপুরদুয়ার যান তবে তিনি ডুয়ার্সের ভূপ্রকৃতি, নদী, জঙ্গল এবং তার চারধারের চা-বাগিচাগুলি প্রত্যক্ষ করবেন। নজর করলে দেখা যায় এই অঞ্চলের নদীগুলি অগভীর এবং বর্ষাকাল ছাড়া অধিকাংশ সময়ই তা শুকনো থাকে। আরও দেখা যায় যে এই নদীগুলি অসংখ্য নুড়ি পাথর, বড় বড় বোল্ডার, পেবল, কোবল এবং বালিতে প্রায় ভরে আছে। কোথাও কোথাও নদীখাতে এত বিপুল পরিমাণ নুড়ি, বোল্ডার, বালি ইত্যাদি জমে আছে যে তার উচ্চতা দুই পাড়ের ভূমির প্রায় সমান এবং কোথাও তার চেয়েও যেন বেশি! প্রশ্ন আসে, প্রবল বর্ষায় পাহাড় থেকে প্রবল জলধারা নেমে এলে সেই জলধারা নদীর দুইপাড়ে যে গ্রামগুলি আছে তার চাইতে অধিক উচ্চতা দিয়ে বইবে না তো? আর অকস্মাৎ প্রবল ভারি বৃষ্টিপাতে হরকা বান (flash flood) হলে ১৯৯৩ সালের 'জলপাইগুড়ি বন্যা'র মত ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাবে না তো? তবে তো অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষ এবং বন্যপশুদের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটবে! বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জীব বৈচিত্রপূর্ণ অঞ্চল কি তবে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে?

সরকারি, বেসরকারি এবং অসরকারি পরিবেশবাদীদের পক্ষ থেকে লাগাতার প্রচার হচ্ছে – শিল্পায়ণ ও নগরায়ণ বিশ্ব উষ্ণায়ণ সৃষ্টি করছে। নদীর উচ্চগতিতে নদীবাঁধ নির্মাণ এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন, ভূটান এবং তার সীমান্তের ভারতীয় ভূখন্ডে (জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা) ডলোমাইট খননকার্যের জন্য জঙ্গল কেটে ফেলায় এই অঞ্চলের নদীগুলিতে এত বিপুল পরিমাণ নুড়ি, বালি, বোল্ডার জমা হচ্ছে যা আগামী দিনে অঞ্চলে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে।

মুনষ্য কার্যকলাপের জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের যে আশঙ্কার কথা পরিবেশবাদীরা তুলে ধরছেন তার বিচার বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েই করতে হবে। তাই বিষয়টি বিবেচনার জন্য সাধারণ নদীবিজ্ঞান, হিমালয় সৃষ্ট নদীগুলির ক্ষয় এবং পলিসঞ্চয়ের বিশেষ বিজ্ঞান প্রথমে চর্চার প্রয়োজন। এরপর আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা টাইগার সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সমীক্ষা রিপোর্ট চর্চা করা হবে কেস স্টাডি হিসেবে। বনাঞ্চল সম্পর্কিত সরকারি তথ্য এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে পরিবেশবাদীদের অভিযোগগুলি আসুন বিচার করে দেখি।

সাধারণ নদী বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিকরা জানাচ্ছেন যে পৃথিবীতে আপাতভাবে স্থির এবং অপরিবর্তনীয় মনে হলেও এই পৃথিবী রয়েছে একটি গতিশীল বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ায় (dynamic evolutionary system)। পৃথিবীর অভ্যন্তর এবং বাইরের স্তরে (বায়ুমন্ডলসহ) সর্বসময় নানা ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন নিরন্তর ঘটে চলেছে। পৃথিবীর উপরিস্তরে (যেখানে আমরা বাস করি) চক্রাকারে কতগুলি প্রক্রিয়া (cyclic process) চলছে বাতাস, বায়ুপ্রবাহ, প্রবাহমান জলধারা, সামুদ্রিক ঢেউ, হিমবাহ ইত্যাদি কতগুলি ভূতাত্ত্বিক এজেন্ট (geological agents) দ্বারা। প্রবাহিত জলধারা এরকমই একটি ভূতাত্ত্বিক এজেন্ট। এর প্রভাবে ভূমির উপর নানা ভূমিরূপ গঠিত হয়। নদী হল একটি শক্তিশালী ভূতাত্ত্বিক এজেন্ট যার দ্বারা ভূপৃষ্ঠে ৩ প্রকার ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় – ক্ষয় (erosion), পলির প্রবাহ (transportation) এবং পলি সঞ্চয় (deposition)। প্রবাহিত জলধারায় যে শক্তি সঞ্চিত থাকে তা থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হয় বা করা হয়। প্রবাহিত জলধারার মধ্যে দ্রবণীয় (solution), ভাসমান (suopended) এবং মিশ্রিত (saltation

& traction) অবস্থায় পলি প্রবাহিত হয়।

নদী হল এক প্রবাহমান জলধারা এবং এই প্রবাহ সৃষ্টি হয় হিমবাহের গলন সৃষ্ট জল বা ঝর্ণার জল দ্বারা এবং বৃষ্টির ঠিক পরে। বৃষ্টির পর ঢালু ভূমির উপর প্রবাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা একত্রিত হয়ে বৃহৎ জলধারার সৃষ্টি করে। এরকম অসংখ্য জলধারাগুলির একত্রিত রূপ হল প্রধান নদী (main stream)। কোন একটি নদীখাত দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে যত পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় তাকে বলে river discharge। সমগ্র অঞ্চল যেখান থেকে জলধারাগুলি সংযুক্ত হয়ে প্রধান নদী সৃষ্টি করে এবং পলিবহণ করে সমুদ্রে বা বৃহৎ হ্রদে পতিত হয় তাকে বলে river basin বা drainage basin।

বহু সময়কাল ধরে একটি নদী তার নিজস্ব উপত্যকা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নদীর সৃষ্টি হয়। নদীর গতিপথের পরিবর্তন এবং প্রবাহমাত্রা ভূমির ঢালের পরিবর্তন, নদীপাড়ের ভাঙন এবং নতুন পাড় গড়ে ওঠা, নদীর ক্ষয়কাজ এবং পলিসঞ্চয়ের প্রকৃতি, যে শিলাস্তর বা মাটির উপর দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় তার চরিত্র, ভূমিরূপের গঠনবৈচিত্র এবং ভূগর্ভস্থ জলের ভূমিকার দ্বারা। ভূমির ঢালের পরিবর্তন হয় ভূআলোড়ণজনিত (tectonic movements) কারণে। ভূতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় (tectonically active) অঞ্চলে ভূমির ঢালের নিরন্তর পরিবর্তন অল্প সময় অন্তরই ঘটে থাকে। ভূমির ঢাল বা নতি (slope) বেশি হলে, একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে জলপ্রবাহ বা discharge বেশি হলে এবং তা বাধা কম পেলে (কঠিন শিলাস্তর এবং গাছপালা প্রবাহে প্রধান বাধা) ঢাল বরাবর ভূমিক্ষয় (slope wash) বেশি হয়। এই slope wash থেকেই নদীখাতের (Sream channel) সৃষ্টি হয়। এই নদীখাতও নানা প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে তার রূপের এবং গতিপথের পরিবর্তন করে।

সামুদ্রিক খাড়ি বা ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলি ভিন্ন নিয়মে সৃষ্ট এবং ক্রিয়াশীল। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটাই এক্ষেত্রে নদীর দ্বারা ভূমির ক্ষয়, পলিপরিবহণ এবং তার সঞ্চয়ের মুখ্য চালিকাশক্তি।

আমাদের একথা সর্বদা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে নদী উপত্যকা ভূতাত্ত্বিকভাবে বেসিন অঞ্চল। ভূতাত্ত্বিকভাবে বেসিন হল এমন নীচু এলাকা যে অঞ্চলে পলি সঞ্চিত হয় এবং সঞ্চিত পলি ধীরে ধীরে মাটিতে বসে যায়। পর্বত থেকে সৃষ্ট নদী যে বিপুল পরিমাণ পলি পরিবহণ করে নদীখাতে জমা করে তার একাংশ নিম্নগতিতে প্রবাহিত হয় স্রোতের সাথে, বাকি অংশ নদীখাতে জমা থাকে এবং সেই পলি সময়ের সাথে মাটির গভীরে বসে যায়।

এখন আমরা হিমালয় অথবা শিবালিক পর্বতমালাজাত নদীগুলির ক্ষয় এবং পলিসঞ্চয়ের বিশেষ বিজ্ঞান জেনে নেব, যা সঠিকভাবে অনুধাবন করলে তরাই ডুয়ার্সসহ হিমালয়ের পাহাড়ী নদীর চরিত্র আমরা বুঝতে সক্ষম হব।

হিমালয়জাত নদীগুলির ক্ষয় এবং পলিসঞ্চয়ের বিজ্ঞান

ভূতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন নদীর ক্রিয়াকলাপের বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। ভারতের আরাবল্লী, বিন্ধ্যপর্বত, নীলগিরি পর্বত বা ছোটনাগপুর মালভূমি (পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া-বাঁকুড়া জেলায় এর অংশবিশেষ পড়েছে) ইত্যাদি ভূতাত্ত্বিকভাবে নিষ্ক্রিয়। তাই এই পর্বতমালা বা মালভূমিগুলি থেকে সৃষ্ট নদীর কার্যকলাপ আর হিমালয়-শিবালিক পর্বতমালা থেকে সৃষ্ট নদীর কার্যকলাপের অনেক পার্থক্য আছে।

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে হিমালয় সৃষ্ট নদীর ক্রিয়াকলাপ (ক্ষয়কার্য, পলি পরিবহণ এবং পলিসঞ্চয় ইত্যাদি) প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল – (১) হিমালয় পর্বতমালায় ক্রিয়াশীল ভূ-আলোড়ণগত বিবর্তন (tectonic evolution) এবং (২) অতীতকাল থেকে বর্তমানকালে জলবায়ুর ক্রমান্বয়ে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন। গবেষকদের মতে নদী উপত্যকাগুলির বিস্তার এবং নদীর দ্বারা পলিসঞ্চয় বৃদ্ধি (aggradation) জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত এবং নদী উপত্যকায় পলিসঞ্চয়ের হার কমে যাওয়া (incision) পর্বতমালার উলম্বভাবে উত্থানের (vertical upliftrnent) পর্যায়কালের সাথে এবং নদী উপত্যকার জলবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত।

হিমালয়জাত গঙ্গা, গন্ডক, তিস্তা, তোর্সা, ব্রহ্মপুত্র নদীগুলিতে জলপ্রবাহের হার বৃদ্ধি পায় বর্ষার মরশুমে। এইসব নদীগুলির উৎপত্তি হয়েছে সেই সব অঞ্চলে যেখানে হিমালয়ের গঠন আকৃতিতে কোন ছেদ পড়েছে (tectonic discontinuity) যেমন কোন চ্যুতিতল (fault plane), শিলারাশির গঠনের পরিবর্তনসূচক স্থান (unconformities) ইত্যাদি। এরকম ভূতাত্ত্বিক সংযোগস্থল থেকে সৃষ্ট হয়েই নদীগুলি উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে এবং ক্রমান্বয় লাগাতার প্লাবনের দ্বারা এই নদীগুলির পলি (নুড়ি, বালি, কাদা ইত্যাদি) পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সমতল বা foreland এ জমা হয়ে সর্বশেষে বঙ্গোপসাগরে বা আরব সাগরে জমা হয়েছে। এই কারণে হিমালয়ের পাদদেশে সৃষ্ট সমতলভূমি (যাকে কোথাও তরাই, কোথাও ডুয়ার্স ইত্যাদি বলা হয়) হল আসলে এই নদীগুলির প্লাবনভূমি।

ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অব হিমালয়ান জিওলজির গবেষকরা

২০০৭-২০১১ এই পাঁচ বৎসরকালে গবেষণা করে (১) বেসিনগতভাবে বিভিন্ন নদীর পলিসঞ্চয় বৃদ্ধি এবং পলিসঞ্চয় থমকে যাওয়ার প্যাটার্ন বা চরিত্র (২) নদীখাতগুলির গঠন এবং দিক পরিবর্তনের এবং ভূ-আলোড়ণের সাথে তার সম্পর্ত এবং (৩) এই পলির প্রধান উৎস কী এবং হিমালয়ের কোন অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়কার্যের হার বর্তমানে বেশি তা নির্ধারণ করেছেন (তথ্যসূত্র ঃ River Systems of Himalaya : Archive of Past climate & Tectonics - Pradeep Srivastav, 2012).

দীর্ঘ পাঁচ বছরের গবেষণার পর গবেষকরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা হল ঃ (১) হিমালয়জাত নদীগুলির নদীখাতে পলিসঞ্চয়বৃদ্ধি এবং তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্যার্টান (Sermentation imasion statistical pattern) জলবায়ুর সাথে সম্পর্কিত। প্রতিবছর শুষ্ক থেকে আর্দ্র এই জলবায়ু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে নদীখাতে পলিসঞ্চয় বেড়ে যায়। নদীখাতে পলিসঞ্চয় কমে যায় বর্ষাকালের শেষের দিকে বা বর্ষাকাল বেশি সময় ধরে চললে।

(২) বর্তমানে হিমালয় পর্বতমালার সম্মুখভাবে এবং শিবালিক পর্বতমালায় (mountain front) বেশি হারে ভূআলোড়ণ চলছে উচ্চতর (Higher Himalaya) হিমালয়ের তুলনায়। এই ভূআলোড়ণ প্রক্রিয়া এবং তার জন্য শিলাস্তরে বিকৃতি (deformation) চলছে সময়ান্তরে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে। প্লাইসটোসিন যুগের শেষ পর্যায় থেকে হলোসিন যুগের (বর্তমান থেকে ১১৭০০ বছর সময়কাল) অর্থাৎ মোট প্রায় ২০ হাজার বছর সময়কাল ধরে ভূআলোড়ণের ফলে হিমালয়ের সম্মুখভাগ এবং শিবালিক পর্বতমালায় (Lesser Himalaya Zone) শিলাস্তরে বিকৃতি চলছে বেশি হারে সমগ্র উত্তরপশ্চিম থেকে উত্তরপূর্ব হিমালয় জুড়ে। তাই হিমালয়ের সম্মুখসারি (Lesser Himalaya Zone) এ নদীর ক্ষয়কার্য শেষ বরফযুগ থেকে কমে গেছে। এই কারণে হিমালয়জাত নদীখাতে উচ্চতর হিমালয়জাত নুড়ি, বালি, পলি বেশি সঞ্চয় হয় হিমালয়ের সম্মুখভাগ বা শিবালিক পর্বতমালাজাত নয়।

এবার চলুন আমরা ডুয়ার্স অঞ্চল এবং বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা টাইগার সংরক্ষিত অরণ্য অঞ্চলের জয়ন্তী নদীর দিকে তাকাই। পরিবেশবাদীদের একাংশের পক্ষ থেকে এই নদীর ভবিষ্যৎ নিয়েই বেশি প্রশ্ন উঠেছে, যার সারমর্ম রচনার শুরুতেই বলা হয়েছে।

ডুয়ার্সের জয়ন্তী নদী উপত্যকার পরিবেশগত সমীক্ষা

এই অঞ্চলে স্কুল অব ইকলজি এন্ড এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়; ডিপার্টমেন্ট অব ইকোলজি এন্ড

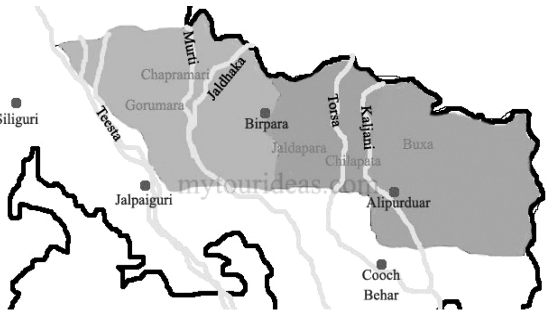

ডুয়ার্সের মানচিত্র

এনভারনমেন্টাল সায়েন্স, পণ্ডিচেরি; ডিপার্টমেন্ট অব এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ, বিশ্বভারতীর গবেষকরা সম্প্রতি একটি সমীক্ষা করেছেন।

সমীক্ষা রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হল – ডুয়ার্স হল জৈব বৈচিত্রে পরিপূর্ণ একটি বিশাল প্লাবনভূমি (flood plain) এবং তা হল উত্তরপূর্ব ভারতের পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ। ডুয়ার্স উপত্যকায় প্রচুর বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য আছে যেমন গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য; জলদাপাড়া অভয়ারণ্য; বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প ইত্যাদি, যা সমগ্র ডুয়ার্স অঞ্চলের বাস্তুতান্ত্রিক সম্পদ।

বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প আলিপুরদুয়ার জেলায় অবস্থিত এবং ৭৬০ বর্গ কি.মি বিস্তৃত। উত্তরে ভূটান, পূর্বে আসাম। পশ্চিম ও দক্ষিণ চা-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র আছে। সমগ্র অঞ্চলে ৩৪টি চা বাগান আছে। প্রকল্পের অধীন এলাকায় ৩৭টি স্থায়ী এবং ৪টি অস্থায়ী গ্রাম আছে। জঙ্গল চিরহরিৎ থেকে অর্ধচিরহরিৎ চরিত্রের এবং শাল, সেগুনসহ নানা উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প দেশের অন্যতম জৈববৈচিত্র সম্পন্ন অঞ্চল এবং এই অঞ্চলে প্রচুর Perennial এবং seasonal অর্থাৎ সারাবছর ধরে প্রবাহিত হয় এমন এবং মরশুমি নদী আছে। জয়ন্তী এখানকার প্রধান নদী যার দুইপাড়ে বিভিন্ন গ্রাম রয়েছে এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। নদীর উৎপত্তি হয়েছে ভূটান-ভারত সীমান্তে। ভূটান এবং সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার জেলায় বহুকাল ধরে ডলোমাইট খনিজ খনন হয়ে আসছে যা ইস্পাত শিল্পে লোহার শুদ্ধিকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। অতীতে এই ডলোমাইট মালগাড়ির মাধ্যমে পরিবহণ হত। জয়ন্তী নদীর উপর অবস্থিত একটা ভাঙা রেলব্রীজ এখনও তার সাক্ষ্য বহন করে। এখানকার ভূটিয়া বস্তি গড়ে উঠেছিল খনি শ্রমিকদের নিয়ে। ১৯৮৩ সালে বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প ঘোষণার পর এই অঞ্চলে ডলোমাইট-এর খননকার্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই অঞ্চলে ভূমির উচ্চতা সর্বোচ্চ ১৭৫০ মিটার এবং সর্বনিম্ন ১২৫ মিটার (সমুদ্রতল থেকে)। এই অঞ্চলে জুন থেকে সেপ্টেম্বরে ভারী বর্ষা হয়, মে মাসেও প্রাক্ বর্ষায় বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ১৯৯৩ সালের কুখ্যাত 'জলপাইগুড়ি ফ্লাড' জঙ্গলের মধ্যকার গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন দিয়েছিল করে দেয়। বহু বন্য পশুও এর ফলে মারা যায়।

এখানকার মাটি হল কাঁকড়মিশ্রিত লোমি মাটি (coarse loamy soil)। নদীখাত কোয়ার্টজাইট, ডলোমাইট, শেল, নাইস ইত্যাদির নানা আকৃতির বোল্ডারে প্রায় পরিপূর্ণ। সারাবছর বোল্ডার বা নুড়িগুলির তলদেশ দিয়ে এবং নদীখাতের মধ্য দিয়ে সরু জলধারা বইতে থাকে যা বন্যজন্তুরা এবং স্থানীয় মানুষ ব্যবহার করে। পাহাড়ে প্রবল বর্ষণ এবং বিশেষ করে যখন হরকা বান হয় তখনই একমাত্র বিশাল আকৃতির বোল্ডারগুলির স্থানচ্যুতি ঘটে।

বিজ্ঞানের আলোকে পরিবেশবাদীদের প্রচার খন্ডন

সমগ্র আলোচনা থেকে এখন পরিবেশবাদীদের নদী সম্পর্কিত প্রচারের সারবস্তু এবং প্রকৃত সত্য বিচার করা যাক।

(১) বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য হিমবাহের অতিরিক্ত গলনে পাহাড়ী নদীগুলিতে অতিরিক্ত পলিসঞ্চয়, বন্যা প্রভৃতি নিয়ে যা প্রচার হয় তার স্বরূপ সমীক্ষণের বিশেষ সংখ্যা (নভেম্বর ২০১৬) "গ্লোবাল ওয়ার্মিক কি মানুষের সৃষ্টি?" তে চর্চা করা হয়েছে। এতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণসহ দেখানো হয়েছে মহাজাগতিক কারণে চক্রাকারে পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন দেখা যায় সময় অন্তরে। দুই গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মধ্যবর্তী পর্যায়ে আসে গ্লোবাল কুলিং এর পর্যায়, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বরফ যুগ বলে। মনুষ্যজনিত কার্যকলাপ (শিল্পায়ণ; নগরায়ণ প্রভৃতি) এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনে এক অতি নগণ্য ভূমিকা পালন করে। সুতরাং পরিবেশবাদীদের এই প্রচার সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান আশ্রিত নয়। সাম্রাজ্যবাদীদের একটি বিশেষ লবির স্বার্থে প্রপাগান্ডামাত্র।

(২) 'শিল্পায়ণ, নগরায়ণ প্রভৃতি মনুষ্য কার্যকলাপের জন্য জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। এতে বন্যপ্রাণীগুলির জৈব বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পৃথিবী থেকে বহু প্রজাতি বিলুপ্তির পথে চলেছে'। এই অভিযোগ প্রসঙ্গে বলা দরকার জীব বিবর্তনের ইতিহাস দেখায় পৃথিবীতে মানুষ আসার বহু পূর্ব থেকেই বহু প্রজাতি (প্রাণী এবং উদ্ভিদ) প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে আবার তার কয়েকগুণ নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে। মানব সভ্যতা বিকাশের পর্যায়েও এই ঘটনা ঘটেছে এবং আগামীতেও ঘটবে। পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র কোন স্থির, অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়, তাও পরিবর্তনশীল এক প্রক্রিয়ায় চলে। প্রসঙ্গত বলা দরকার প্রকৃতিতে উষ্ণায়ণের যুগেই জীব বৈচিত্র বেড়েছে এর উদাহরণও 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি মানুষের সৃষ্টি' পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে জীব বৈচিত্র নিয়ে পরস্পর বিরোধী তথ্য প্রচারিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এবং বটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রতিবছর তার সার্ভে রিপোর্টে নতুন প্রজাতির সন্ধানের খবর প্রকাশ করে। এমন রিপোর্ট সমীক্ষণেও অতীতে প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে গভীর বনাঞ্চল মোট পৃথিবীর স্থলভাগের ২.৬১ শতাংশ জুড়ে আছে, মাঝারি গভীর বনাঞ্চল মোট পৃথিবীর স্থলভাগের ৯.৫৯ শতাংশ এবং মুক্ত বনাঞ্চল মোট পৃথিবীর স্থলভাগের ৯.১৪ শতাংশ জুড়ে রয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান পৃথিবীর স্থলভাগের ২১.৩৪ শতাংশ এখনও বনভূমি। শিল্প বিপ্লবের পর পৃথিবী জুড়ে বনভূমির ব্যাপক হ্রাস হলেও বিগত ১৫-২০ বছরে বনভূমির আয়তন ধীরে ধীরে বাড়ছে। ভারতে বিশ্বের ক্রান্তীয় জলবায়ুর বনভূমির ৬ শতাংশ রয়েছে যা বিশ্বের অষ্টম স্থানে। ২০১৫-১৭ সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের বনভূমি বনসৃজনের ফলে মোট ২১ বর্গ কি.মি বৃদ্ধি পেয়েছে (রাজ্যে মোট বনভূমি ১১৮৭০ বর্গ কি.মি যা রাজ্যের স্থলভূমির ১৬.৩৪%)। পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলায় বনভূমির আয়তন ১০৬৭১৫ হেক্টর এবং তা এই জেলার আয়তনের ৩৮.৩% জুড়ে রয়েছে এবং ২০১৫-১৭ পর্যায়কালে এই জেলায় ২ শতাংশ বনভূমির বৃদ্ধি ঘটেছে।

সুতরাং তথ্যের সাথে প্রচারের মিল নেই। বর্তমানে পুঁজিবাদে চলছে এক ভয়াবহ মন্দা। শিল্প উৎপাদনের গতি নিম্নমুখী। এই কারণে মালিকশ্রেণী বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র হিসাবে বনসৃজন করছে। জঙ্গলের শাল, সেগুনের মত দামী কাঠ এবং নানা বনজ সম্পদের উপর থেকে জঙ্গলবাসীর অধিকার হরণ করে তা কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক ইত্যাদি গড়ে সাধারণ মানুষকে বনজ সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পরিবেশবাদীদের 'বনসৃজন কর' এই প্রচার তাই কার্যতঃ কর্পোরেটদের স্বার্থ হাসিল করছে।

(৩) বলা হচ্ছে 'ডলোমাইট খনন এবং অন্যান্য খননকার্য হওয়ায় জঙ্গলের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ভূমিক্ষয় বেড়ে যাওয়ায় হিমালয়জাত নদীগুলি বিশেষতঃ ডুয়ার্সের জয়ন্তী, তোর্সা ইত্যাদি নদীতে এত নুড়ি পাথর জমা হচ্ছে। এতে নদীর বেড ভরে দুইপাড় থেকে নদীর উচ্চতা বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্ষায় নদীর

জল গ্রামের উপর দিয়ে বইবে এবং অঞ্চলের জীববৈচিত্র ধ্বংস হবে'।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, প্রথমতঃ জয়ন্তী অঞ্চলে ডলোমাইট খনন বন্ধ আছে ১৯৮৩ সাল থেকে। ভূটান এবং ডুয়ার্সের ডলোমাইট খনিগুলির অধিকাংশই বন্ধ। এর কারণ ভিন্ন। ১৯৮০-র দশক থেকে ইস্পাত উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল হিসাবে ডলোমাইটের বিকল্প আবিস্কৃত হয়েছে। ডিউনাইট, পেরিডোটাইট, পারক্সিনাইট প্রভৃতি আগ্নেয়শিলা এবং ম্যাগনেশিয়াম ঘটিত অনেক শিলা এর বিকল্প কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি শিল্প উৎপাদন, বিশেষত লৌহ-ইস্পাত শিল্পের মন্দা ডলোমাইটের চাহিদা ও বাজার দর কমিয়ে দিয়েছে।

যাই হোক, ডলোমাইট মাইনিং এর জন্য জয়ন্তী নদীর এই হাল! এটা সত্যের অপলাপ মাত্র। প্রাকৃতিক কারণেই প্রধানতঃ নদীর ক্ষয় এবং সঞ্চয়কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। হিমালয়জাত নদীর ক্রিয়াকলাপের উপর গবেষণা রিপোর্ট থেকেও দেখা যাচ্ছে প্লাইসটোমিন বরফযুগের শেষ পর্যায় থেকে নদীগুলির ক্ষয়কার্য এবং সঞ্চয় জলবায়ু পরিবর্তন এবং হিমালয় ও শিবালিক পর্বতমালার উত্থানের সাথে সম্পর্কিত। Lesser Himalaya অঞ্চলে (যেই অঞ্চলে ডলোমাইট খনিগুলি অবস্থিত) হিমালয়ের ক্ষয়কাজের হার বর্তমান পর্যায়ে কম Higher Himalaya অঞ্চলের তুলনায়। সুতরাং পরিবেশবাদীদের এই অপপ্রচারের সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। এছাড়া ডলোমাইট পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, উপকারি। জঙ্গল অধ্যুষিত ডুয়ার্সের জল পচা গাছপালার রসশিক্ত হওয়ায় আম্লিক চরিত্রের। ডলোমাইট ($Ca\ CO_3 .\ Mg\ CO_3$) চূর্ণ জলে মিশলে জলের অম্লত্ব কমে। এই কারণে স্থানীয় কৃষকরা ডলোমাইট চূর্ণ কৃষি জমিতে ব্যবহার করেন।

(৪) আমাদের আবারও স্মরণ করা দরকার যে সমগ্র ডুয়ার্স হল এক বিশাল প্লাবনভূমি, যেখানে প্লাইসটোমিন বরফ যুগের পর থেকে হিমালয়জাত নদীগুলি বিপুল পরিমাণ পলি (নুড়ি, বালি, কাদা) জমা করে চলেছে। এইসব নদীতে প্রাচীন কাল থেকেই শত সহস্রবার প্লাবন হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।

জয়ন্তী নদী

বিজ্ঞান চেতনায় ঋদ্ধ মানব সমাজের কর্তব্য নদীগুলির নিয়ম ভালভাবে জেনে, তাতে কি প্রক্রিয়া চলছে ভালভাবে বুঝে মানব সভ্যতা রক্ষায় সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করা। এই প্লাবনগুলিকে মানবসমাজের স্বার্থে যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা এবং মানুষের বাসভূমি বিপজ্জনক অঞ্চল থেকে সরিয়ে আনা। মানব সমাজের স্বার্থে বন্যজন্তুদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় যতদূর সম্ভব রক্ষা করা। এটাই হল বিজ্ঞানসম্মত পরিবেশ সচেতনতা।

(৫) 'জয়ন্তী নদীতে জমা বোল্ডার, নুড়ি জমা হয়ে নদীর বেড পাশের গ্রাম থেকে উঁচু হয়ে গেছে। তাই জলপ্রবাহ তার উপর দিয়ে বইবে'... এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায় জল তার ধর্ম অনুসারে উপর থেকে নীচে বয়ে যায়। নদীর জলধারাই পূর্বে সঞ্চিত নুড়ি, পলি, বালিকে স্থানচ্যুত করায়। এছাড়া নদী যেহেতু বেসিন অঞ্চলে প্রবাহিত হয় তাই নদীখাতে জমা পলি সময়ান্তরে মাটির নীচে বসে যায় ক্রমান্বয়ে আইসোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম বজায় রাখার জন্য। এই ঘটনা না ঘটলে পলি জমে জমে সকল পাহাড়ী নদীর গতি রুদ্ধ হয়ে যেত।

সবশেষে বলা দরকার, পরিবেশবাদী দৃষ্টিকোণ ছেড়ে আমাদের সব বিষয়েই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে পরিবেশ প্রেমী হতে হবে।■

তথ্যসূত্রঃ

(১) River Systems of Himalaya : Archive of Past climate & Tectonics, Pradeep Srivastav 2012 (২) Geological action of River - Prof. A. Balasubramaniam 2013 (৩) Environment Survey & Photographic Documentation of a Forest Edge Hamlaed Situated in Buxa Tiger Reserve, India, Sayam Bhattacharya 2012 (৪) Geology & Tectonic Evolutim of Himalaya - Indian Academy of Science (৫) West Bengal - Forest Survey of India 2017 (৬) Dooars-Wikipedia (৭) https://india. mangaboy.com. (৮) Forest Survey of India 2017

বিজ্ঞানের বিস্তারিত খবর ঃ

সমলিঙ্গের দুটি ইঁদুর থেকে নতুন অপত্যের জন্ম

যৌন জননের মাধ্যমে বংশবিস্তারকারী প্রাণীদের ক্ষেত্রে স্ত্রী গ্যামেট ও পুংগ্যামেট মিলনের ফলে জাইগোট উৎপন্ন হয় - যা ক্রমে পূর্ণাঙ্গ শিশুতে রূপান্তরিত হয়। এটাই যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের প্রাকৃতিক নিয়ম।

অতি সম্প্রতি, 'Cell stem cell' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে চীনের, "Chinese Academy of Scince' – এ দুটি পরিণত স্ত্রী ইঁদুরের জিন এডিটিং এবং স্টেম সেলের সাহায্যে সুস্থ অপত্য ইঁদুরের জন্ম হয়েছে। বিশ্বে এই ঘটনা প্রথম। এই অপত্য ইঁদুর গুলি পরিণত বয়সে প্রাকৃতিক নতুন বংশধরের জন্ম দিয়েছে। যদিও ইতিপূর্বে একই প্রজাতির সমলিঙ্গের প্রাণী থেকে নতুন বংশধর সৃষ্টির অন্য পদ্ধতিগুলি ব্যর্থ হয়েছে। এই নতুন সাফল্য যৌন জননের মাধ্যমে বংশবিস্তারের প্রাকৃতিক নিয়মের প্রাচীর চূর্ণ করল।

এই গবেষণায় প্রথমে দুটি পরিণত পুরুষ ইঁদুরের সাহায্যে চেষ্টা করা হয়। নতুন অপত্য ইঁদুরের জন্মও হয়। কিন্তু তারা মাত্র ৪৮ ঘন্টা জীবিত ছিল। পরে দুটি পরিণত স্ত্রী ইঁদুর নিয়ে এই পদ্ধতিতে ২১০টি ভ্রূণ তৈরী সম্ভব হয় যার মধ্যে ২৯টি স্বাভাবিক, সুস্থ এবং প্রাকৃতিক জীবনচক্র পূর্ণ করেছে।

এই গবেষণায় Haploid Embryonic stem cells (ESC) ব্যবহার করা হয়। একটি পরিণত স্ত্রী ইঁদুরের Haploid Embryonic stem cell এর জিনোমের তিনটি imprinting অংশ, বিজ্ঞানীরা বাদ দিয়ে, অন্য পরিণত স্ত্রী ইঁদুরের ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করায়। এর ফলেই সমলিঙ্গের দুটি পরিণত স্ত্রী ইঁদুর থেকে নতুন অপত্য ইঁদুরের জন্ম সম্ভব হয়েছে।■

প্রতিস্থাপিত জরায়ুতে সন্তান ধারণ

Lancet জার্নালে এক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে ব্রাজিলের সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসক বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় জেনেটিক্যাল কারণে জরায়ু না থাকা ৩২ বছর বয়সী এক মহিলার শরীরে জরায়ু প্রতিস্থাপনের পর ঐ মহিলা এক জীবিত সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়েছে। বিশ্বে এই সাফল্য প্রথম।

এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে চিকিৎসক বিজ্ঞানীদের দ্বারা ২০১৪-১৫ সাল থেকে ঐ মহিলার শরীরে ধারাবাহিক কতগুলি অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত জরায়ু প্রতিস্থাপনের পরে।

যে মহিলার জেনেটিক্যাল কারণে জরায়ু ছিল না, তার শরীরে সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের হসপিটালে দীর্ঘ ১০ ঘন্টার অস্ত্রপ্রচারে জরায়ু রোপন করা হয়। জরায়ু দাতা মৃত্যুর পূর্বে তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন জরায়ু প্রতিস্থাপনের চার মাস পূর্বে দেহের বাইরে নিষেক সম্পন্ন করে যে blastocyst উৎপন্ন হয় তাকে নিম্ন তাপমাত্রায় বিশেষ কৌশলে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। জরায়ু প্রতিস্থাপনের ৭ মাস পরে ঐ সংরক্ষিত blastocyst কে প্রতিস্থাপিত জরায়ুতে রোপন করা হয়। এর ৩৫ সপ্তাহ পরে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান ভূমিষ্ট হয়। বর্তমানে মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ আছে।■

আদিম মানব প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ণ

নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে যে আজ থেকে ৯৫,০০০ বছর পূর্বের এক মহিলার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে যাতে একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মানুষের বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেছে। সাইবেরিয়ার গুহা থেকে পাওয়া এই জীবাশ্মের হাড়ের জিনোম বিশ্লেষণ করে জানা গেছে এর অর্ধেক Neanderthal এবং বাকি অর্ধেক Denisovan। এই প্রথম বিজ্ঞানীরা মানুষের এমন এক জীবাশ্মের সন্ধান পেলেন যা থেকে বিজ্ঞানীদের অনুমান ঐ মহিলার পিতা ও মাতা ছিলেন দুটি ভিন্ন প্রজাতির মানুষ। বিবর্তনের পথে তা কোন হারিয়ে যাওয়া কোনো "মিসিং লিঙ্কের" জীবাশ্ম নয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে আদিম মানব প্রজাতিগুলির মধ্যে সংকরায়ণ প্রক্রিয়া জারি ছিল। আধুনিক মানুষ হোমো সেপিয়ান সেপিয়ান এর বিবর্তনের ইতিহাসে জানতে এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।■

চঞ্চু বিশিষ্ট কচ্ছপের জীবাশ্ম

চীনের গুইঝাউ প্রদেশ থেকে এক বিশাল আকার কচ্ছপের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত ২২৮ মিলিয়ন বছরের পুরনো কচ্ছপের এই জীবাশ্মের বৈশিষ্ট্য হলো এর খোলক নেই এবং চঞ্চু আছে। কচ্ছপটির জীবাশ্মের পেছনের আশ দেখেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে এর খোলক ছিল না। গবেষকরা এর নাম দিয়েছে চঞ্চু যুক্ত কচ্ছপ।

এই জীবাশ্মটির বিষয়ে গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ দিন ধরে খুঁজে চলেছেন কিভাবে আধুনিক কচ্ছপ খোলকযুক্ত হলো – যা তাদের জলের নীচে বসবাসের উপযোগী করে তুলেছে। জীবাশ্মটি থেকে দেখা গেছে এই বিশালাকার চঞ্চু যুক্ত কচ্ছপটির আকৃতি ছিল বেস-বল খেলার ব্যাটের ন্যায়।■

কার্বনের নতুন রূপভেদ – "Schwarzite"

কার্বনের আরও একটি রূপভেদ আবিস্কৃত হলো – যার নাম "schwarzite"। এটি ফুলারিন (3D form) এবং গ্রাফিন (2D form) থেকে পৃথক এবং ঋণাত্মক বক্রতা (Negatively Curved) বিশিষ্ট। এই গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ "Proceedings of the Natimal Academy of Science" জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

জার্মান পদার্থবিদ Herman Schwarz ১৮৮৯ এর দশকে তত্ত্বগতভাবে সাবানের ফ্যানার বক্রতলের সঙ্গে কার্বনের তলের সাদৃশ্য অনুসন্ধান করেছিলেন। এর বহু পরে ১৯90 এর দশকে Carbon Cage molecules এর গবেষণা যখন গতি পেল তখন আবার Schwarz এর নাম উঠে এলো ঋণাত্মক বক্রতা বিশিষ্ট কার্বন তলের জন্য।

সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের গবেষকরা Zeolite Templated carbons (ZTCs), সিলিকন ডাই-অক্সাইডের ক্রিস্টালের মধ্যে কার্বন কিরূপ আকার ধারণ করে তা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। পর্যবেক্ষণরত অবস্থায় তারা লক্ষ্য করেন যে তাদের অজান্তেই তারা এক বিশেষ রূপের কার্বন তৈরি করে ফেলেছেন।

বিজ্ঞানীদের মতে কার্বনের এই নতুন রূপভেদের মধ্যে বিপুল পরিমাণে ইলেকট্রিক চার্জ ধারণ করা সম্ভব। ফলে কার্বনের এই রূপভেদ ব্যবহার করে বাজারে প্রচলিত ক্যাপাসিটর এর থেকে উচ্চ মানের ক্যাপাসিটর বানান সম্ভব। Schwarzite এর অভ্যন্তরিন আয়তন বড় হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে অণু ও পরমাণু ধারণ করতে পারে। Zeolite এর মতন একে পেট্রোলিয়াম এবং ন্যাচারাল গ্যাস শিল্পে অনুঘটক রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইতিপূর্বে কার্বনের অন্য দুই রূপভেদ ফুলারিন ও গ্রাফিন – প্রযুক্তি জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এরই ফলস্বরূপ ১৯৯৬ খ্রীঃ রসায়নে (ফুলারিন) এবং ২০১০ খ্রীঃ পদার্থবিদ্যায় (গ্রাফিন) নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এখন Schwarzite এর বহুমুখী ব্যবহার দেখার অপেক্ষায় প্রযুক্তিবিদরা।■

আইসল্যান্ডে বিজ্ঞানীরা প্রযুক্তির সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড হ্রাসে সফল

আইসল্যান্ড দেশটি হল উত্তর আটলান্টিক সাগরের মাঝে অবস্থিত কতগুলি আগ্নেয়গিরিজাত দ্বীপের সমষ্টি। আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত হওয়ায় (ভূত্বকের নীচে ম্যাগমা চেম্বারের সক্রিয় উপস্থিতির জন্য) এই দেশের প্রয়োনীয় বিদ্যুৎশক্তির প্রায় অর্ধেক হল জিওথার্মাল এনার্জি। অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ তাপ থেকে শক্তি উৎপাদন করা হয়।

সম্প্রতি জিওথার্মাল শক্তি উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন যে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডকে আবদ্ধ করে কার্বোনেট যৌগে রূপান্তর করবেন। বিজ্ঞানীরা হেলিকোডি জিওথার্মাল শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রকে তাদের পরীক্ষাগারে রূপান্তর করেন। এই পরীক্ষাগার রয়েছে আইসল্যান্ডের ভূত্বক ব্যাসল্ট পাথরের উপর। এই আগ্নেয় শিলায় অসংখ্য ছিদ্র আছে। বিজ্ঞানীরা কার্বনডাই অক্সাইড মিশ্রিত সমুদ্রের জলকে পাম্পের সাহায্যে ব্যাসল্ট পাথরের ছিদ্রে ইনজেক্ট করান। প্লান্ট থেকে যে স্টিম নির্গত হয় তাতে প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে। তাকে তরলীকৃত করে পাথরে ইনজেক্ট করা হয়। বাস্তবে যা সোডা ওয়াটারের ন্যায়। দুই বছর পর দেখা গেছে ব্যাসল্ট পাথরের ছিদ্রে অবস্থিত ক্যালমিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহের সাথে বিক্রিয়া করে নানা কার্বনেট যৌগ তৈরি হয়েছে ওইসব ছিদ্রে।

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় যে ঘটনা ঘটতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে বিজ্ঞানীরা তা সম্পন্ন করলেন দুই বছরে (ভূতাত্ত্বিকদের হিসেবে এক মুহূর্তে)। বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ করেছেন যে মাত্র দুই বছরে জোর করে পাথরের ছিদ্রে পাঠানো তরলীভূত কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রায় সবটাই কার্বোনেট খনিজ উৎপাদন করেছে। কৃত্রিম উপায়ে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডকে কমানোর ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ভূমিকা আগামী দিনে বিশাল আকার নেবে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান।■

(তথ্যসূত্র ঃ দ্য হিন্দু ০৯/০৫/২০১৯)

বিজ্ঞানের খবর

জানুয়ারি ২০১৯

১. নাসার "নিউ হরাইজন" মহাকাশযান সৌর-মণ্ডলে এখনও পর্যন্ত সবচাইতে দূরে পাড়ি দিয়ে "আলটিমা থুলি" নামক একটি সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা জ্যোতিষ্কের ফোটো তুলেছে। এটি পৃথিবী থেকে ৪০০ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

৩. "চায়না ন্যাশনাল স্পেশ এডমিনিস্ট্রেশান" চাঁদের দূরতম অংশে Chang'e 4 মিশন এর সফল ভাবে অবতরন করাতে সক্ষম হয়েছে। তথ্যসূত্র – বিবিসি নিউজ

৪. সুইজারল্যান্ড এর লউসানে তে অবস্থিত "ইকলে পলিটেকনিক ফেডেরালে ডে লউসানে" গবেষণা কেন্দ্রে গবেষকরা এমন এক নতুন ধরনের ট্রানজিস্টার আবিস্কার করেছেন যার, অনেক কম শক্তি ক্ষয় হয় ও তাপের অপচয় ও অনেক কম হয়। তাই এই ট্রানজিস্টারগুলি ব্যবহারের ফলে ইলেক্ট্রনিকস যন্ত্রগুলি অনেক বেশি কার্যকর হয়ে উঠবে। তথ্যসূত্র – ইকলে পলিটেকনিক ফেডেরালে ডে লউসানে

৪. এমআইটি গবেষকরা এমন এক কণার আবিস্কার করেছেন যা এম-আরএনএ এর তথ্য বহন করতে পারে এবং যা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে এবং এর ফলে ফুসফুসের সিস্টিক ফাইব্রোসিস নামক রোগের চিকিৎসায় উপযোগী ভূমিকা পালন করবে। তথ্যসূত্র – এমআইটি

৮. আমেরিকার ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জির প্রিন্সটন প্লাজমা ফিসিক্স ল্যাবোরেটরির গবেষকরা ফিউশন নিউক্লিয়ার রিঅ্যক্টর এর "টিয়ারিং মোড" কে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন এর ফলে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া আরও সহজতর হয়ে উঠবে। তথ্যসূত্র – প্রিন্সটন প্লাজমা ফিসিক্স ল্যাবোরেটরি

৯. ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ারউইক এর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হোয়াইট ডোয়ার্ফ নক্ষত্র গুলি ক্রিস্টালে রূপান্তরিত হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন। তথ্যসূত্র – ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ারউইক

১১. আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের গবেষকরা ত্রিমাত্রিক বা ৩ডি প্রিন্টিং এর এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যা চিরাচরিত পদ্ধতির থেকে ১০০ গুণ বেশি দ্রুততার সাথে কাজ করে। তথ্যসূত্র – সায়েন্স ডেইলি

১৭. ডার্টমাউথ কলেজের বিজ্ঞানীরা অস্ট্রালোপিথেকাস সেডিবার মধ্যে বৃদ্ধি অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস ও অল্প বয়স্ক হোমো হ্যাবিলিস এর অ্যানাটমি বা দৈহিক গঠনের সাথে মিল পেয়েছেন। তথ্যসূত্র – ইউরেকাঅ্যালার্ট

২৩. ইংল্যান্ডের কুইন্স মেরি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন এর গবেষকরা এই প্রথমবার IRAS16293-2422 B নামক একটি সূর্যের ন্যায় নক্ষত্রের মধ্যে গ্লাইকোনাইট্রাইল এর খোঁজ পেয়েছেন। গ্লাইকোনাইট্রাইল হচ্ছে এমন একটি প্রি-বায়োটিক অণু যা প্রাণের সৃষ্টির আগের পর্যায়ে তৈরি হয়। তথ্যসূত্র – ইউরেকাঅ্যালার্ট

২৪. নাসার অপরচুনিটি রোভার মঙ্গলের মাটিতে ১৫ বছর অতিক্রান্ত করলো। তথ্যসূত্র – নাসা

২৯. আমেরিকার ইন্ডিয়ানার পারডিউ ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষকরা প্লাস্টিক জঞ্জাল থেকে হাইড্রোকারবনিক ফুয়েল বানানোর প্রক্রিয়ার ওপরে গবেষনাপত্র প্রকাশ করেছেন। তথ্যসূত্র – পারডিউ ইউনিভার্সিটি

৩১. অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন আরএমআইটি ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এমন এক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর উদ্ভাবন করেছেন যা ১৯৮০ দশকের একটি বিখ্যাত ভিডিও গেম 'মনটেজুমাস রিভেঞ্জ' গুগল ডিপমাইন্ড এর থেকে ১০ গুণ দ্রুততার সাথে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে। তথ্যসূত্র – আরএমআইটি ইউনিভার্সিটি

ফেব্রুয়ারি ২০১৯

১. নাসার "মার্স কিউরিওসিটি রোভার" মঙ্গরের গেল ক্রেটারে অবস্থিত পর্বত "মাউন্ট শার্প" এর ঘনত্ব এই প্রথম সফলভাবে পরিমাপ করতে সক্ষম হলো, এর ফলে পর্বতটি কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছিলো সে সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হোল। তথ্যসূত্র – নাসা

৩. ব্রিটেনের "ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ারউইক" এর স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় গবেষকরা অ্যালবুমিনের সাথে জড়িত রাসায়নিক ইরিডিয়াম এর দ্বারা এমন এক ধরনের ফটোসেন্সিটাইজড অণুর আবিষ্কার করেছেন যা ক্যান্সার কোষকে ভেদ করতে পারে ও ধ্বংসও করতে পারে। তথ্যসূত্র – ইউরেকাঅ্যালার্ট

৬. স্পেনের "ইন্সটিটিউটো দে অ্যাস্ট্রোফিজিকা দে কানারিয়াস" এর বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে ১৬৭০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কেপলার-১০৭এ এক্সোপ্ল্যানেটের মধ্যে সংঘর্ষের প্রমাণ পেয়েছেন। তথ্যসূত্র – ইউরেকাঅ্যালার্ট

৭. আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার রিচমন্ডের 'সানগামো থেরাপিউটিক্স' ঘোষণা করেছে যে এই প্রথমবার মানুষের শরীরের ভেতর থেকেই জিন এডিটিং করার মাধ্যমে ডিএনএ-র স্থায়ী পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। তবে ডিএনএ'র স্থায়ী পরিবর্তন করার পরবর্তী পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনও চলছে। তথ্যসূত্র – ইউ এস ন্যাশনাল লাইব্রেরী অফ মেডিসিন

১১. জেনেটিক্স স্টাডি আর আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সি কে ব্যবহার করে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা মানুষের এমন এক পূর্বপুরুষের খোঁজ পেয়েছেন যার জিনের সাথে নিয়ান্ডারথাল বা ডেনিসোভান বা কোনও সংকর মানুষের সাথে মিল নেই। তথ্যসূত্র – সায়েন্স অ্যালার্ট

১৮.ব্রিটেনের অক্সফোর্ডের অক্সফোর্ড আই হসপিটালের চিকিৎসকরা জিন থেরাপির মাধ্যমে সর্ব প্রথম এক মহিলার 'বয়ঃজনিত কারণে চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়ার সমস্যার (ম্যাকুলার ডিজেনেরেশান)' চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলেছেন। তথ্যসূত্র – বিবিসি

১৯. একটি আন্তর্জাতিক গবেষকদের দল আইসোটোপের মাধ্যমে এটা জানতে পেরেছেন যে কিছু নিয়ান্ডারথাল মাংস ভক্ষণ করত। তথ্যসূত্র – ফিজ ডট ওআরজি

২১. একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের দল এমন এক ডিএনএ আবিষ্কার করেছেন যাতে ৪টি প্রাকৃতিক ও ৪টি কৃত্রিম নিউক্লিওবেস আছে। এই ডিএনএর মাধ্যমে অনেক বেশি ডিজিটাল ডেটা ষ্টোর করে রাখা যাবে এছাড়া ভিনগ্রহের প্রাণের সন্ধানেও এটি কাজে আসতে পারে। বিজ্ঞানীরা এই ডিএনএর নাম দিয়েছেন হাচিমোজি ডিএনএ। তথ্যসূত্র – নিউ ইয়র্ক টাইমস

২১. আমেরিকার ওয়াশিংটনের জ্যোতির্বিজ্ঞানিরা সৌর-মণ্ডলের সব চাইতে দূরের একটি জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার করেছেন যা সূর্য থেকে ২১ বিলিয়ান কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তথ্যসূত্র – স্পেস ডট কম

২৫. ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখের গবেষকরা জানতে পেরেছেন যে নিয়ান্ডারথালরা আধুনিক মানুষের মতই ঋজুভাবে হাঁটতে পারত। এতদিন যে ধারণা ছিল যে নিয়ান্ডারথালরা কিছুটা ঝুঁজে হাঁটত। তথ্যসূত্র – সায়েন্স অ্যালার্ট

২৬. অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের আরএমআইটি ইউনিভার্সিটির গবেষকরা একটি তরল ধাতু ব্যবহার করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কে পুনরায় কয়লায় রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছেন। তথ্যসূত্র – সায়েন্স ডেইলি

২৮. চীনের ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি অফ চায়নার গবেষকরা ইঁদুরের চোখে ন্যানো পার্টিকাল ইঞ্জেক্ট করে ইঁদুরের চোখে ইনফ্রারেড ভিশন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তথ্যসূত্র – সায়েন্স ডেইলি

মার্চ ২০১৯

৩. একটি চালক বিহীন প্রয়োগমূলক মহাকাশ যান সফলভাবে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে অবতরণ করেছে আর অবতরণ করার কিছুদিন পরে ফিরেও এসেছে। এর পরবর্তীতে এই প্রয়োগমূলক মহাকাশ যান মানুষকেও মহাকাশে নিয়ে যেতে পারবে। তথ্যসূত্র – নিউ ইয়র্ক টাইমস

৪. আমেরিকার বালটিমোরের জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির গবেষকরা একটি কম্পিউটার মডেলের সাহায্যে 'অ্যাস্টেরয়েডকে যে সহজে ভাঙ্গা যায় না তার কারণ অ্যাস্টেরয়েড তার গ্রাভিটেশানাল ফোর্সের জন্য তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া টুকরোগুলোর সাথে জুড়ে যেতে পারে' – এটি পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন। তথ্যসূত্র – নিউ ইয়র্ক টাইমস

৭. আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজির গবেষকরা এমন একটি অপটিকাল ইমেজিং পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যার মাধ্যমে মানব শরীরের গভীরে থাকা অতি ক্ষুদ্র টিউমারেরও সন্ধান দিতে পারে। তথ্যসূত্র – সায়েন্স ডেইলি

৮. ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ভর তার অভ্যন্তরে ১২৯০০০ বছর আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে ১.৫ ট্রিলিয়ান সোলারমাস (১ সোলারমাস = 2×10^{30} kg), আগে যা ভাবা হয়েছিলো এই সংখ্যাটা তার দ্বিগুণ আর এই গ্যালাক্সির ৯০% ভরই হচ্ছে ব্ল্যাকহোল। তথ্যসূত্র – সায়েন্স অ্যালার্ট

১১. জাপানের একদল বিজ্ঞানীরা উলি ম্যামথের কোষের নিউক্লিয়াস যখন ইঁদুরের কোষে প্রতিস্থাপন করে তখন সেই কোষগুলিতে বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়া লক্ষ করেন। তথ্যসূত্র – নিক্কেই এশিয়ান রিভিউ।

১৫. মহাকাশে থাকাকালীন মানুষের দেহে বেশ কিছু সুপ্ত ভাইরাস সক্রিয় হয়ে ওঠে এর ফলে নভশ্চরদের বিভিন্ন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। তথ্যসূত্র – নাসা

১৮. ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের ইউনিভার্সিটি অফ হাডার্সফিল্ডের গবেষকরা বিভিন্ন জিনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে আধুনিক হোমো সেপিয়েন্সরা ৩ লক্ষাধিক বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে উঠে পূর্ব আফ্রিকাতে আসে আর তারপর পূর্ব আফ্রিকা থেকে ৬০,০০০ বছর আগে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরে। তথ্যসূত্র – সায়েন্টিফিক রিপোর্ট

১৯. আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, রিভারসাইডের গবেষকরা এমন এক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেখানে কার্বন মনোক্সাইড ভিনগ্রহের কোন উদীয়মান প্রাণের জৈবসঙ্কেত হতে পারে। তথ্যসূত্র – ইউরেকা অ্যালার্ট

২০. উত্তর-পশ্চিম চীনে প্যালিওন্টোলজিস্টরা অ্যভিমিয়া সুইৎজারেই নামক এক পাখির জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন যেটি প্রায় ১১৫ মিলিয়ন বছর পুরানো। তথ্যসূত্র – নেচার কমিউনিকেশান

২৭. ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়া এক্সট্রিমোফাইল নামক এক ধরনের জৈব বস্তু প্রায় ১৮ মাস মহাশূন্যে জীবিত ছিলো এর দ্বারা তত্বগতভাবে প্রমাণ করা যায় যে মঙ্গল গ্রহে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিলো। তথ্যসূত্র – সায়েন্স অ্যালার্ট ডট কম

২৮. গবেষকরা মঙ্গল গ্রহের অনেক গভীরে জল থাকার প্রমাণ পেয়েছেন, তারা এমনও প্রমাণ পেয়েছেন যে ওই ভুগর্ভস্থ জল মঙ্গরের বিষুব রেখার কাছাকাছি পৃষ্ঠতলেও জলের সরবরাহ করতে পারে। তথ্যসূত্র – ইউরেকা অ্যালার্ট

২৯. আমেরিকার নর্থ ডাকোটাতে জীবাশ্ম বিশেষজ্ঞরা প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ বছরের পুরানো জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছেন। তথ্যসূত্র – ইউরেকা অ্যালার্ট

ঃ সংগঠন সংবাদ ঃ

মন্দিরবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ গত ১৬ই মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণার কৃষ্ণদেবপুর মাস এডুকেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক অলৌকিকতা বিরোধী প্রদর্শনী করে।

শহীদ দিবসে কার্যক্রম ঃ গত ২৩শে মার্চ শহীদ ভগৎ সিং, শুকদেব এবং রাজগুরুর শাহদৎ দিবসে ভগৎ সিং স্মৃতি উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বাণে পুরুলিয়া জেলার হুলকা গ্রামে ছাত্র-যুব-মেহনতী জনতার মাঝে একটি অনুষ্ঠান হয়। শহীদদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার শপথ গ্রহণ করার পাশাপাশি কুসংস্কারের স্বরূপ উন্মোচনকারী কার্যক্রম চালানো হয়।

ওই একই দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোচরণ অঞ্চলের গাববেড়িয়া এলাকায় অখিল ভারত প্রগতিশীল ছাত্রমঞ্চ এবং সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটির ডাকা শহীদ দিবস অনুষ্ঠানেও বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সকালে শতাধিক ছাত্র-যুবরা প্ল্যাকার্ড-ব্যানার সুসজ্জিত সাইকেল মিছিলে এলাকা পরিভ্রমণ করে এবং বিকালে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং আলোচনাসভা হয়।

আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান ঃ গত ৩০শে মার্চ ২০১৯ আসানসোল ইস্টার্ন রেলওয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিজ্ঞানের আলোকে তার প্রতিকার, বিষয়ে ভিডিও ক্লিপিংস সহযোগে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বন্যা-সাইক্লোন-ভূমিকম্প-সুনামি-বজ্রপাত বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা পেশ করা হয়। কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস'এর বিরোধিতায় 'ম্যাজিক'কে ব্যবহার করেন স্থানীয় শাখার এক সদস্য দক্ষতার সাথে। বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা তার যে ব্যবস্থা সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল উক্তদিনের সভায় সেই প্রবন্ধ রচনাগুলির উপর মনোজ্ঞ আলোচনা পেশ করা হয় এবং উপস্থিত বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও অন্যান্য গুণী মানুষ ছাত্রছাত্রীদের উপহার দিয়ে উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আয়োজক ইস্টার্ন রেলওয়ে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমেত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রাক্তন শিক্ষক মহাশয়রা অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বক্তব্য পেশ করেন এবং নিয়মিত অন্তরালে এরকম অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তথা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

পুরুলিয়া ঃ গত ৩১ মার্চ বিজ্ঞান মনস্ক, পুরুলিয়া শাখার পক্ষ থেকে জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভাগৃহে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে দর্শক-শ্রোতাদের অভিনন্দন জানিয়ে পুরুলিয়া শাখার পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করা হয়। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এরপর শুরু হয় বিতর্কসভা। বিতর্ক সভার বিষয় ছিল "বিজ্ঞানের বিকাশ সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে প্রসারিত"। মোট ৫ জন বির্তকের পক্ষে এবং বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেন। যুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। সভার সঞ্চালকরা সুষ্ঠভাবে সভা পরিচালনা করেন এবং বিপক্ষের বক্তাদের জয়ী ঘোষণা করেন। দর্শকদের পক্ষ থেকে গান ও আবৃত্তি পেশ করা হয়।

বিতর্ক সভার পর সংগঠনের পক্ষ থেকে কুসংস্কার বিরোধী – অন্ধবিশ্বাস বিরোধী উপস্থাপনা পেশ করা হয়।

এরপর 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিজ্ঞানের আলোকে তার প্রতিকার' শীর্ষক সেমিনার উপস্থাপিত করা হয় ভিডিও শো-এর মাধ্যমে। দক্ষতার সাথে ঝড়-বজ্রপাত-সুনামি-ভূমিকম্প প্রভৃতির প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয় এবং এযাবৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে কিভাবে তার থেকে মানুষ গবাদি পশু-সম্পত্তি রক্ষার জন্য সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে তা উপস্থাপন করা হয়। পরিশেষে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানের আগে এলাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং সিধু-কানু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারপত্র বিতরণ করে প্রচার চালানো হয়। এই প্রচারের ফলে বহু ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানে সামিল হয়।

সমুদ্রগড়, পূর্ব বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড় অঞ্চলের নিমতলায় গত ১২ই এপ্রিল প্রায় সারাদিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় ক্লাবের সহযোগিতায় বিজ্ঞান মনস্ক'র স্থানীয় শাখার পরিচালনায় একটি বিজ্ঞান

সমুদ্রগড়, পূর্ব বর্ধমান

পুরুলিয়া

সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রচুর গ্রামীণ জনতা, ছাত্রছাত্রী, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার বুদ্ধিজীবীরা অংশগ্রহণ করেন। সুদৃশ্য ব্যানারে 'সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি', বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার, অসুখ-বিসুখ নিয়ে সুদৃশ্য পোষ্টারের প্রদর্শন হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন মডেল প্রদর্শন, নানা অঞ্চলের পাথর এবং জীবাশ্মের প্রদর্শন হয়। এই প্রদর্শনী দেখতে মানুষের আগ্রহ ছিল লক্ষ্য করার মত। সন্ধ্যায় ছোট এবং বড়দের নানা আবৃত্তি, গান পরিবেশিত হয়। এরপর অলৌকিকতা বিরোধী বিজ্ঞানের প্রদর্শন করা হয়। তারপর ছাত্রছাত্রী এবং গ্রামীণ জনতাকে নিয়ে ভিডিও এবং চিত্র সহযোগে 'প্রশ্নোত্তরের আসন' অনুষ্ঠান হয়। প্রায় ১৮ জন ছাত্রছাত্রী এবং অসংখ্য গ্রামবাসী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে একজন শিক্ষক ভাষণে বলেন "এই ধরনের অনুষ্ঠানকে স্বাগত। এই সংগঠনের মুখপত্র সমীক্ষণ আমি পড়ি। পত্রিকার উদ্দেশ্য এবং মান যথেষ্ট ভাল।" অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী শ্রী প্রভাস বিশ্বাসের স্মরণে দু-চার কথা বলা হয়। প্রভাস বিশ্বাসকে স্মরণ করেই অনুষ্ঠান পরিচালনা করে বিজ্ঞান মনস্ক। উক্ত শিক্ষকও বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রসারে প্রভাস বিশ্বাসের ভূমিকার উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে 'লিটল টেরোরিস্ট' এবং 'দ্য আদার পেয়ার' নামক দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আশুতি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ গত ১২ই মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার আশুতি অঞ্চলের গ্রামবাসীদের মধ্যে একটি ছোট কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করা হয়।

মে দিবস ঃ প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে আহুত বিভিন্ন সভায় বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

বইমেলা ঃ গত মার্চ মাসে কলকাতার বেহালা সখের বাজার চন্ডীর মাঠে অনুষ্ঠিত বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক উপস্থিত থেকেছে। তবে অসময়ে হওয়া এই মেলায় তেমন ভিড় দেখা যায় নি।■

গল্প ঃ

"ভূতের লাভ"

– রক্তিম দাস

ভরা পৌষের রবিবারীয় জমজমাট সোনারপুর বাজার। গা-গলানোর জায়গা নেই। তারিমধ্যে শ্রীমন্তবাবু কোনোরকমে সাইকেল ঠেলে মাছ বাজারে গেলেন। মাছ কিনে মাছওয়ালি মাসিমাকে মাছ কাটতে দিতে গিয়ে দেখলেন লাইনে আরো তিনজন দাঁড়িয়ে আছেন। অগত্যা কি আর করবেন। মাছওয়ালি মাসিমার ছেলে, পঙ্কজকে ডেকে বললেন – পঙ্কজ মাছটা কেটে দে। পঙ্কজ বলল – বাবু একটু দেরী হবে। সে তো দেখেই বুঝতে পারছি, আর কি করা যাবে দেরী হোক। – বললেন শশাঙ্কবাবু। শশাঙ্কবাবু দাঁড়িয়ে খেয়াল করলেন মাসির হাতে বঁটিতে যুদ্ধ চললেও পাশের মাছওয়ালির সাথে গল্পে মশগুল। শশাঙ্ক বাবু কানটা সজাগ করে বুঝবার চেষ্টা করলেন। মাছওয়ালি মাসিমা বললেন – হ্যাঁরে রীনারমা, রগর শুনবি? ভূত তাড়ানোর রগর। রীনার মা বললে – কী রগর রে? মাসিমা বললে – কয়েকদিন আগে আমার ভাসুর পো, কেষ্টা আত্মহত্যা করেছে। গত পরশুরাতে সেই বাড়িতে কি চিৎকার চেঁচামেচি। ঘুমচোখে আমি আর পঙ্কজ গিয়ে দেখলাম বাড়ির সকলে ভয়ে সিটকে গিয়ে চিল চিৎকার জুড়েছে। কেষ্টার বাবা তো সহদেবকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বললো – পঙ্কজ আমাদের বাঁচা। পঙ্কজ ধমক দিয়ে বললে – আরে ধ্যাৎ চিৎকার থামিয়ে বলতো কি হয়েছে। কেষ্টার বাবা বললে – কেষ্টার প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। ঘরে বাসন কসন ফেলছে। দুমদাম আওয়াজ করছে। সহদেব রাগান্বিত হয়ে বললো – ঠিক আছে বুঝেছি-বুঝেছি, যাও যে যার বিছানায় যাও, আমি দেখছি। বাইরের দিকটা দেখে এসে বললো কোথাও কিছু নেই, যাও শুয়ে পড়।

পরদিন সকাল হতে না হতে কেষ্টার বাপ পাড়ার হেবি ওয়েট ব্রাহ্মণ, মুখুজ্যে মহাশয়ের কাছে গিয়ে সব বললেন। তিনি সব শুনে বললেন – চলবাপু তোমার বাড়িতে একবার যেতে হবে। বাড়িতে এসে মুখুজ্যে বামুন সব খুঁটিয়ে জানলেন। বললেন গলায় দড়ি, অপঘাতে মৃত্যু, প্রেতাত্মা খরচ তো একটু বেশি পড়বে কেষ্টার বাপ, সারারাত ধরে সাতবামুনে যজ্ঞ করতে হবে। প্রেতাত্মাকে ভিটে থেকে তাড়াতে হবে। ভিটে বন্ধ করতে হবে। কেষ্টার বাপ বললো – ঠাকুর মশাই সেতো বুঝলাম কিন্ত কত টাকা পড়বে? ঠাকুর মশাই চিন্তান্বিত ভঙ্গিমায় বললেন – তা হাজার চব্বিশ দিলেই হবে। কেষ্টার বাপ শুনে বললে এত টাকা! ঠাকুর মশাই বললেন তোমার বলে চব্বিশের কথা বললাম নয়তো তিরিশ হাজারের কমে একাজ হয় না। কেষ্টার বাপ কাচুমাচু হয়ে বললে ঠিক আছে আর কি করা যাবে!

বামুন কথা সেরে আমার ঘরে এলো। বুঝলি তো রীনার মা! রীনার মা বললে – তারপর কী হল? বামুন এসে আমার কাছে বললো – শুনেছতো সব পঙ্কজের মা। বলছিলাম কি একই যখন ভিটে, তোমরা যদি অল্প-স্বল্প কিছু দাও, বেশি না হাজার ছয় দিলেই হবে তাহলে পুরো ভিটেটা বন্ধ করে দিই। ঐ শালা প্রেতাত্মা এ ভিটের চৌহদ্দিতে ঘেঁষতে পারবে না। আমি বললাম ঠিক আছে বামুন ঠাকুর, আপনি যখন বলছেন তখন আমি ছেলেদের সঙ্গে একটু কথা বলেনি।

বামুন ঠাকুর চলে গেলে আমি আমার মেজ ছেলের কাছে যাই। ছেলে তখন দোতলার ঘর রং করছে। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম – তাপস বামন ঠাকুর এসে বলছিলো আমরা যদি হাজার ছয়েক টাকা দিই তাহলে পুরো ভিটা বন্ধ করে দেবে। কেষ্টার আত্মা আর আসতে পারবে না। তাপস আমাকে ধমক দিয়ে বললো তুমি থামোত বংশের লোকেরা এ ভিটেতে আছে থাক! তাড়ানোর কোনো দরকার নেই। যতসব আজগুবি গল্প, যাওতো এখান থেকে।

রীনার মা বললে তারপর কী হলো দিদি? তারপর যথারীতি পাঁজি-তিথি দেখে ঘোর অমাবস্যা রাতে যজ্ঞ শুরু হল। জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে ঘৃতাহুতিতে অগ্নি দাউ-দাউ জ্বলতে লাগলো। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে লাগলো সাত-বামুনের মন্ত্র উচ্চারণ। আমাদের সহদেব রগর দেখতে-দেখতে ভাবলো ঘোচ্ছাচ্ছি শালাদের প্রেত তাড়ানো। সে রাতের অন্ধকারে পুকুরের জলে বড়-বড় মাটির ডেলা ফেলতে লাগলো। সেই আওয়াজ শুনে বামুনেরা উৎফুল্ল হয়ে বাড়ির লোকেদের ডেকে শোনালো ঐ দেখো শালা ভিটে ছেড়ে পালাচ্ছে। আর থাকতে পারছেনা। সহদেব রগর দেখছে আর পুকুরে মাঝে মধ্যে ডেলা মারছে। সহদেবের তাতেও আঁশ মিটছে না। এবার ফিরে এসে বেশ

খানিকটা স্টোনচিপ নিয়ে অ্যাজবেসটারের চালে ছড়িয়ে দিলো। সেই স্টোনচিপের গড়গড়ানির আওয়াজ শুনে মুখুজ্যে বামুন বললে – শালা আবার ফিরে এসেছো। দেখাচ্ছি মজা। শাকরেদদের বললো-এই তোমরা আর একটু কড়া-ডোস দাওতো। দেখি বাছাধন কোথায় যায়! সহদেব গল্পের সুর ধরে নিয়ে বললো – সে রগরের কথা কি আর বলবো কাকিমা! বামুনগুলো অগ্নিকুন্ডে আরো ঘি ঢালতে লাগলো, লম্বা-চওড়া মন্ত্রের তুফান তুলতে লাগলো। রীনার মা বললো – তার পর কি হল বাবা? তারপর কি হবে? আমি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম প্রেতাত্মা চলে গেল ব্যাস।

গল্পের শেষ না হতেই শশাঙ্কবাবু মুচকি হেসে বললেন – ও ভূত তাড়ানোর গল্প হচ্ছে? তবে যাই বলুন প্রেতাত্মার কারণে আমার কিন্তু লাভ হয়েছে। সহদেব বললো তার মানে? তার মানে হল বছর পাঁচেক আগে মিশন পল্লীতে আমার বাড়ি কেনার সময় এমন একটা কান্ড হয়েছিল, দালাল মারফৎ বাড়িটা বিক্রির খবর এসেছিল আমার কাছে। দালালের কাছ থেকে জানতে পারলাম নতুন সাজানো-গোছানো বাড়িটা বিক্রি করে বাড়িওয়ালা চলে যাবে। শুনে আমার খটকা লাগলো। চিন্তা করলাম নতুন বাড়ি বানিয়েছে অথচ থাকবে না? তা কেন? দালাল এড়িয়ে সরাসরি-বাড়ির মালিকের কাছে চলে যাই। আলাপ পর্ব সেরে আমি জানতে চাইলাম আচ্ছা আপনারা বাড়িটা বিক্রয় করছেন কেন? নিচুস্বরে বাড়িওয়ালা বললো – কী বলবো ভায়া। বড়ো সাধ করে বাড়িটা বানিয়েছিলাম। কিন্তু ভায়া কপাল, নইলে বাড়িটা বিক্রয় করতে হয়? তুমি ভায়া কিনবে বলছো তাই তোমাকে সত্য কথা বলি, নাহলে পরে আমাকে গালমন্দ করবে।

আসলে কি জানো ভায়া, বাড়িতে শান্তিতে থাকতে পারছি না। প্রতিটি রাত আমাদের কাছে বিভীষিকা। রাত হলেই ঘরে ভিতরে-বাইরে দুরুম-দারুম আওয়াজ। দোষ আছে ভায়া, এ ভিটেতে দোষ আছে। শুনে আমি একটু চিন্তা করে বললাম – আপনার বাড়িটা আমি কিনতে পারি তবে আমাদের একটা রাত থাকতে দিতে হবে। তারপর আমি জানাবো আপনাকে বাড়িটা কিনবো কিনা? কল্যাণ বাবু কথাটা শুনে একটু ভাবনায় পড়লেন। আমি বললাম আপনার কোনো চিন্তা নেই। আমি শুধু নিজকানে প্রেতাত্মার আওয়াজ শুনতে চাই। কল্যাণবাবু রাজি হলেন।

সেই মতো আমি ২০১৩ সালের ২১শে জুলাই কল্যাণ বাবুর বাড়িতে হাজির হই। সঙ্গে নিলাম পাঁচ ব্যাটারির একটা টর্চ লাইট। কল্যাণ বাবু বাড়ির চারিপাশটা দেখিয়ে দরজাগুলো দেখিয়ে ভয়ার্ত চোখে বললেন – সাবধানে থাকবেন বাবু। আমি তাহলে এখন আসি।

আমি রাতের খাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা করতে লাগলাম। মেঘলা ওয়েদার, গুমোট পরিবেশ রাতের গভীরতা যত বাড়ছে নিশি পতঙ্গের সংগীত ও ব্যাঙের বাজনা ততই বাড়ছে। আর আমি তখন বিছানায় শুয়ে চিন্তা করছি, চিন্তা করতে করতে আওয়াজ কানে এলো বলে মনে হলো। সন্তর্পণে উঠে বসে টর্চ লাইটটা মুষ্টিবদ্ধ করে আওয়াজটা কোনদিক দিয়ে আসছে বোঝবার চেষ্টা করলাম। পা টিপে টিপে সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আবার আওয়াজ হলো। আওয়াজটা বাথরুমের দিক দিয়ে আসছে বলে মনে হলো, সেদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। দরজা খুলে নিঃশব্দে বাইরে বেড়িয়ে বাড়ির চারিদিকটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। বাড়ির পিছনে চেম্বারের দিক দিয়ে ক্ষীন আওয়াজ শুনলাম। টিপটিপ পায়ে চেম্বারের কাছে গিয়ে দাড়ালাম। দাড়াম করে আওয়াজ হলো। ভয় পেয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে কল্যাণবাবু ফিরে এসেই উৎসুক্যের সাথে জিজ্ঞাসা করলো – আপনার রাতে ভয় করেনি তো? উত্তর দিলাম – করেছিল। যথারীতি প্রেতাত্মার আওয়াজ হয়েছিল। শুনুন আপনার বাড়ি আমি কিনবো। তবে ভুতুরে ভিটেতো ১৫ লাখের বেশি দেবো না। কল্যাণ বাবু বললেন – তা কি করে হয় ভায়া। না হয় আমি চললাম। এই দামে পোশায় দিন না হলে থাক। আচ্ছা ঠিক আছে তোমার দামিই দিও। – কল্যাণ বাবু বললো।

সহদেব বললো – তারপর কী হলো বাবু? তারপর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বর্ষা কমে এলে বাড়িটায় চাপলাম। ঐ দিনই দুটি লেবার ডেকে এনে বললাম চেম্বারের ঢাকনাটা খোলোতো। খুলে দেখলাম ইয়া বড়-বড় হাইব্রিট মাগুর। দেখে তো আমরা হতবাক। মনে মনে ভাবলাম এই তাহলে সেই প্রেতাত্মা।

পাড়া থেকে পাম্প এনে চেম্বার ছেঁচানো হল। সেই মাছ এই বাজারেই বিক্রি করলাম। মাসিমা শুনে বললেন – সত্যি বাবু মাগুর ভূতে ২৫ লাখের বাড়িটা আপনাকে ১৫ লাখে করে দিলো। সকলে মিলে স্বহাস্যে উল্লসিত হল। শ্রীমন্তবাবু বললেন পঙ্কজ তাড়াতাড়ি মাছটা দে। গল্প করতে করতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল। ওদিকে যে গিন্নি ক্ষেপবে।■

পড়ার বইয়ের বাইরে পড়া

সৌমি আটা, নবম শ্রেণী
আসানসোল ওল্ড স্টেশন উচ্চ বিদ্যালয়

[বিজ্ঞান মনস্ক'র আসানসোল শাখার পক্ষ থেকে ওই শহরের বিভিন্ন স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিষয় ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক বিকাশের স্বার্থে। মোট ৯টি রচনা জমা পড়ে। এদের মধ্যে নবম শ্রেণীর ছাত্রী সৌমি আটা'র রচনাটি একটি নমুনা হিসাবে প্রকাশ করা হল। – সম্পাদক, সমীক্ষণ]

পড়াশুনা তো প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরই সাধনা। আমরা রোজ স্কুল যাই নানান জিনিস শিখতে ও বুঝতে। অজানাকে জানতে। তবে এই পড়াশুনার বাইরেও পড়ে রয়েছে বিশাল এই জ্ঞানের ভান্ডার, যা আমাদের সাধারণ জনগণের কাছে অজানাই থেকে যায়। সবাই ছোটে তার স্বপ্নকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরই ইচ্ছে এমন কিছু করার বা হওয়ার যাতে করে কিছু রোজগার হবে। তাকে সারাজীবন বাবা-মার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে না। তবে আমার স্বপ্ন অন্য সকলের চেয়ে বেশ আলাদা। প্রথমত আমারও ইচ্ছে সারাজীবন ধরে কারও ওপর নির্ভরশীল না হয়ে থাকা। ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল গায়িকা হব এবং 'পপ' গান করব। তা স্বপ্নটা স্বপ্নের জায়গায়ই রয়েছে। আর আমি এগিয়ে চলেছি নিজের লক্ষ্যে। তবে ছেলে-বেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমার কৌতূহলটা একটু বেশি। যেমন, আমি আমার বয়সের উর্দ্ধে গিয়েই জানার চেষ্টায় থাকি সেসব বিষয়, যা এই বয়সে বোঝা বা জানার চেষ্টা বৃথা! আমি নবম শ্রেণির ছাত্রী ইতি মধ্যে বিজ্ঞান বইতে 'মিউটেশন' পড়ে আমার বড্ড কৌতূহল হয় 'জিন' সম্পর্কে জানতে। আমার বাবাও এই বিষয়েরই অধ্যাপক ছিলেন। তাই কোন অসুবিধে হল না 'মিউটেশন' ও 'জিন' বিষয়ে জানতে। হ্যাঁ, জীবনবিজ্ঞান আমার প্রিয় বিষয় আর মানব দেহ নিয়ে জানার আমার বড্ড ইচ্ছে। তা বলে যে আমি ডাক্তার হব বা হতে ইচ্ছুক এমনটা ভাবা ভুল। তবে যদি সরকারি চাকরি করতে হয় তবে আমি এই বিষয়েরই অধ্যাপক হব যা নিশ্চিত আমার কাছে। তা এসব গেল পড়াশোনার ব্যাপার, জ্ঞান অর্জনের ব্যাপার। আমার বিশেষ কৌতূহল রয়েছে যে বিষয়ে তা হল ইংরেজি সাহিত্য। বহু ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকদের লেখা আমি পড়েছি। এরমধ্যে আমার 'এ্যানা ফ্রাঙ্ক' এর লেখা 'মাই ডায়রি' বইটি বেশ আলাদা ও ভালো লেগেছে, এছাড়াও 'অস্কার ওয়াইল্ড', জেরম. কে. জেরম, এ. জি. গারডিনার প্রভৃতি নানান লেখকদের লেখা আমি পড়েছি। আমি ক্লাস ফাইবে বাবার বুক স্টোর থেকে লুকিয়ে হেলেন কেলারের আত্মজীবনী পড়ে ফেলেছিলাম। আর সেই থেকেই হিটলারের ওপর আমার খুব রাগ রয়েছে। তবে এখন এই লোকটির কুকৃতি মুখস্ত না করলে ইতিহাসে নাম্বার পাওয়াটাও মুশকিল, তাই পড়তেই হবে। তবে একসময়ে ইতিহাস পড়তেও বেশ ভাল লাগত, এখনও ভালোই লাগে। তবে সেরকম ভক্তি নেই। এছাড়াও আমি বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু বিখ্যাত লেখকের বই পড়েছি। যেমন – রবীন্দ্রনাথের ছুটি, ছেলেবেলা, বেশকিছু কবিতা। এছাড়াও 'মোষের কবিতা' উপন্যাসটি পড়ে ফেলেছি একই পদ্ধতিতে লুকিয়ে। তবে পুরোটা পড়ে অর্ধেকের মতো অংশই ঘটে ঢুকেছে। আমি সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সমগ্র বেশখানিকটা পড়েছি। আর প্রফেশর শঙ্কু সমগ্র সবটাই পড়ে ফেলেছি, বেশ ভালোই লিখতেন। তাঁর বেশ কিছু সিনেমাও দেখেছি। আর বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের অপুর সংসার গ্রন্থটিও পড়েছি তবে সম্পূর্ণ হয়নি। এই গুলি ছিল পড়ার বাইরে পড়া, জগৎটা জগতের মতো করে দেখা। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা অন্য কোনো সরকারি চাকুরের কাজ, হ্যাঁ বেতন মোটা হলেও এই সকল জায়গায় মানুষ সরকারের চাকরের মতই সম্মান পায়। সে যতই বড়ো কাজ করুক না কেন দুনিয়াতে তারা চিরস্থায়ী হতে পারে না। তাই আমি আমার লক্ষ্যে অবিচল। যদিও বাবা-মার কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক আশা দেখিনি। তবুও এটাই আমার লক্ষ্য, আর আমি মূল্যহীন নই। এক না একদিন নিশ্চয়ই ছুব আমার স্বপ্নকে। তবে পড়াশোনার বাইরে যেভাবে বইয়ের মাধ্যমে আমি এই জগৎটাকে চিনছি জানছি তাতে করে আমি যে কতটা উপকৃত তা আমি বুঝি। আমি একটা স্বাধীন জীবন চাই। সবাই চায় তবে, মানুষের লক্ষ্যই মানুষকে সেটা এনে দেয়। আমার শুরুটা বদলাতে পারি না, তবে যেখানে আছি সেখান থেকেই নতুন করে শুরু করলে শেষটা আমরা বদলাতেই পারি। ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : www.samikshan.com